Tomader Ei Nogore by Humayun Ahmed

তোমাদের এই নগরে

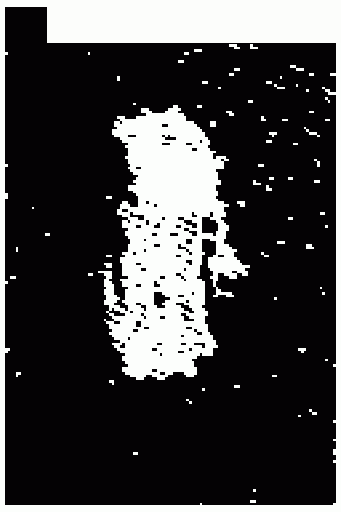
হুমায়ূন আহমেদ



উৎসর্গ

এ.এফ.এম. তোফাজ্জল হোসেন

এই মানুষটি জীবনে কোনো কিছুই চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করেন নি। তবু তাঁর বন্ধুরা তাঁকে আদর করে ডাকে— চ্যালেঞ্জার।



রাতে দরজা জানালা খোলা রেখে ঘুমানোর কিছু উপকার আছে। ঘরে বাতাস খেলে, নিজেকে প্রকৃতির অংশ বলে মনে হয়, খাঁচার ভেতর ঘুমুচ্ছি এরকম মনে হয় না। খোলা দরজা দিয়ে চোর ঢুকবে এবং ঘরের জিনিসপত্র সাফ করে দেবে তাও কিন্তু না। চোরদের গাইড-বুক বলে, তালাবন্ধ ঘরে তালা ভেঙে ঢুকবে। কিন্তু দরজা জানালা সবই খোলা এমন ঘরে কখনো ঢুকবে না— সমস্যা আছে। কেউ খামাখা দরজা খোলা রাখে না। নিশ্চয়ই কোথাও 'কিন্তু' আছে। চোরেরা 'কিন্তু' ভয় পায়।

চোরদের সাইকোলজির উপর ভরসা করেই আমি দিনের পর দিন দরজা জানালা খোলা রেখে ঘুমাই কখনোই কোনো সমস্যা হয় নি। কিন্তু কোনো একটা ব্যাপার কয়েকদিন হল ঘটেছে— প্রায় রাতেই ঘরে চোর আসছে বলে আমার ধারণা। চোর ধরতে পারছি না। অনেকের থাকে পাতলা ঘুম। খুটখাট শব্দ হলেই এরা লাফ দিয়ে উঠে বসে। গলায় মাইক ফাটিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে— কে কে কে কে? আমার উলটো ব্যাপার। খুটখাট শব্দে আমার ঘুম গাঢ় হয়। তখন আর চোখ মেলতে পারি না।

প্রতি রাতেই ঘুমুবার সময় ভাবি— আজ চোর ধরতে হবে। যেভাবেই হোক ব্যাটাকে বেঁধে মেসের ম্যানেজারের হাতে তুলে দিতে হবে। সে চায়টা কী? কী আছে আমার ঘরে যে রোজ রাতে আসতে হবে।

পরিকল্পনা পর্যন্তই, পরিকল্পনা আর কাজে খাটে না। শেষে ঠিক করলাম— দূর ছাই চোর ঘুরুক চোরের মতো। আমি ঘুমাই আমার মতো। সে আমার ঘর থেকে নেবেটা কী? তোষকের নিচে রাবার ব্যান্ড দিয়ে বাঁধা পাঁচ শ' টাকার

নোটের তোড়া নেই। আখরোট কাঠের বাক্সে হীরার নেকলেশ নেই। টেবিলের উপর সস্তার একটা টাইমপিস আছে এটা নিয়ে যেতে চাইলে নিয়ে যাক। খামাখা চোরের বিষয়ে টেনশন করে ঘুম নষ্ট করে লাভ কী? দিলাম লেজ পেতে। লেজে পা দিয়ে চোর আসলে আসুক।

তখনি চোর ধরা পড়ল। হঠাৎ ঘুম ভেঙে দেখি চোর চেয়ারে বসা। ঘরে চাঁদের আলো। চারপাশ মোটামুটি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি— চোরের পরনে চেক লুঙি, গায়ে স্যান্ডো গেঞ্জি। তার মুখ দেখা যাচ্ছে না— সে বসে আছে আমার দিকে পিঠ দিয়ে। পায়ে স্পঞ্জের স্যান্ডেল। দ্রুত পা নাচাচ্ছে বলে স্যান্ডেলে থপথপ শব্দ হচ্ছে। শব্দের মধ্যেও ছন্দ আছে।

থপথপ থপ থপপস
থপথপ থপ থপপস

স্যান্ডেল সংগীত আমি মোটামুটি মন্ত্রমুগ্ধ হয়েই শুনছি। স্যান্ডেলের থপথপ শব্দ থেমে গেল। চোর এবার টেবিলের ড্রয়ার ধরে টানাটানি করতে লাগল। এই ড্রয়ারটা শক্ত। চট করে খোলা মুশকিল। তবে খুললেও সমস্যা কিছু নেই। ড্রয়ার ফাঁকা থাকার কথা। কিছু চিঠি পত্র, একটা চাবির রিং, দেয়াশলাই এবং মোমবাতি। এর বেশি কিছু থাকার কথা না।

বেশ শব্দ করে ড্রয়ার খুলল। এই শব্দে আমার ঘুম ভাঙল কি না চোর চট করে আমার দিকে একবার তাকিয়ে দেখেও নিল। এখন সে আগ্রহ নিয়ে ড্রয়ার হাতড়ে দেখছে। এখন তার হাতে চাবির রিং। ঝনঝন করে রিং বাজাচ্ছে। মনে হল রিং বাজিয়ে বেশ মজা পাচ্ছে। এর মধ্যেও একটা ছন্দ আছে— রিনরিন রিন ঝিন রিনরিন রিন ঝিন। এবার সে উঠে দাঁড়াল। চাবির রিংটা এখনো তার হাতে আছে। চাবি দিয়ে ট্রাংক বা স্যুটকেসের কোন তালা খুলবে এরকম কোনো মতলব কি করছে? করলে ভুল করবে। আমার ঘরে স্যুটকেস, ট্রাংক কিছুই নেই। রিং ভরতি চাবিই শুধু আছে। খোলার মতো তালা নেই।

চোরটা আমার খাটের কাছে উবু হয়ে বসল। হাত বাড়িয়ে খাটের নিচ থেকে কী যেন নিল। আবার গিয়ে চেয়ারে বসল। চোরের হাতে এখন বিস্কুটের টিন। খাওয়াদাওয়ার অনিয়ম থেকে আমার আলসার হয়েছে এরকম সন্দেহে রূপা এই বিস্কুটের টিন আমাকে দিয়েছে। এক-দুই ঘণ্টা পরে পরে যেন বিস্কুট

খেয়ে এক গ্লাস পানি খাই। আমি যে কাজটা এখনো করতে পারি নি— চোর তা বেশ আয়েশ করেই করছে দেখা গেল। সে জগ থেকে গ্লাসে পানিও ঢেলেছে। বিস্কুট খেয়ে পানি খাওয়া হবে তারপর নিশ্চয়ই আরাম করে সিগারেট ধরানো হবে। সিগারেটের প্যাকেট এবং দেয়াশলাই আছে আমার বালিশের নিচে। এই ঘরের সব কিছুই এই চোরের জানা। কাজেই সে যে সিগারেটের জন্যে বালিশের নিচে হাত দেবে এটা প্রায় নিশ্চিত। চোরকে এই কাজটা করতে দেব, না তার আগেই উঠে বসব বুঝতে পারছি না। 'হ্যালো ব্রাদার কেমন আছেন?' এই প্রশ্ন করা যেতে পারে। আচমকা এই প্রশ্ন শুনে চোর হঠাৎ ঘাবড়ে গিয়ে পেটে ছোরা বসিয়ে দেবে না তো? চোরেরা সঙ্গে ছোটখাটো অস্ত্র রাখে বলে শুনেছি— ছোরা, ব্লেড, ক্ষুর। Small range weapons.

কুড়মুড় কুড়মুড় শব্দ হচ্ছে। চোর বিস্কুট খাচ্ছে। আমি উঠে বসলাম। এমন অদ্ভুত পরিস্থিতিতে গলার স্বর যতটা স্বাভাবিক রাখা যায় ততটা স্বাভাবিক রেখে বললাম, কেমন আছেন?

কুড়মুড় শব্দে বিস্কুট খাওয়া বন্ধ হল। চোর পানির গ্লাসে চুমুক দিয়ে ঠোঁট মুছে আমার চেয়েও স্বাভাবিক গলায় বলল, জি ভালো।

'কী করছেন?'

'বিসকিট খাচ্ছি।'

'পরিচয় জানতে পারি?

'দুই শ' আঠারো নম্বরের বোর্ডার। আমার নাম জয়নাল। ঘরে আলো কম তো এই জন্যে চিন্তে পারছেন না। মতিঝিল ব্রাঞ্চের কৃষি ব্যাংকে কাজ করি। কেশিয়ার। লাইট জ্বালালেই চিনবেন।'

'এখানে কী করছেন?'

'বসে আছি।'

'বসে আছেন সে তো দেখতেই পাচ্ছি। নিজের ঘর ছেড়ে আমার ঘরে বসে আছেন কেন?'

'রাগ করছেন?'

'রাগ করি নি তবে খুবই অবাক হচ্ছি। আপনি রাতে প্রায়ই আমার ঘরে আসেন তাই না?'

'জি।'

'এসে কি করেন বিসকিট খান?'

'বিসকিট এর আগে একবার শুধু খেয়েছি। সেদিন খেয়েছিলাম দুটা, আজ খেয়েছি একটা।'

'ও আচ্ছা।'

'মাঝে মধ্যে সিগারেট খাই। সিগারেটের প্যাকেট যদি টেবিলে থাকে তখনই খাই। আপনার বালিশের নিচে থাকলে খাই না, আপনার ঘুম ভেঙে যাবে। এটা তো বিবেচনায় রাখতে হবে।'

ভদ্রলোকের বিবেচনায় মুগ্ধ হয়েই বোধ হয় বালিশের নিচ থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে তাঁর দিকে এগিয়ে দিলাম। তিনি সহজ ভঙ্গিতে সিগারেটের প্যাকেট নিলেন। তবে সিগারেট ধরালেন না। নিচু গলায় বললেন, ভাই সাহেব নিশ্চয়ই আমাকে পাগল ভাবছেন? এবং আমার উপর খুবই রাগ করছেন। রাত বিরাতে আপনার ঘরে ঢুকি। নিজের মতো ঘোরা ফিরা করি। বিস্কুট খাই, সিগারেট খাই। ট্রেসপাসিং কেইস। আপনি ইচ্ছা করলে আমাকে পুলিশেও দিতে পারেন। পুলিশেই দেওয়া উচিত। আমি নিজে হলেও তাই করতাম। এই ধরনের কাজ করে আমি বড় লজ্জিত। ক্ষমা করবেন।

জয়নাল সাহেবের কথা শুনে মনে হচ্ছে না তিনি লজ্জিত কিংবা দুঃখিত। তিনি বিস্কুটের টিন খুলে আরেকটা বিস্কুট নিলেন। আমার দিকে তাকিয়ে থাকলেন। মনে হচ্ছে বিস্কুট খেতে সংকোচ বোধ করছেন। আমার অনুমতি ছাড়া খাবেন না। আমি বললাম, 'খান বিস্কুট খান।'

জয়নাল সাহেব ছোট্ট করে নিশ্বাস ফেলে বললেন— 'রাত জাগলে প্রচণ্ড ক্ষিধে লাগে। রাত তিনটার পর ক্ষিধার চোটে মাথা আউলা হয়ে যায়। আমার বিছানায় একটা কোল বালিশ আছে। কোল বালিশকে মনে হয় কলা। কভার খুলে খেয়ে ফেলতে ইচ্ছা করে।'

'রাত জাগেন কেন?'

'এই তো আসল প্রশ্ন করেছেন। রাত জাগি কারণ আমার রাতে ঘুম হয় না। শুনলে মনে করবেন বানিয়ে বলছি। একুশ বছর আমি রাতে ঘুমাই নাই। সামান্য ভুল বললাম, একুশ বছর এখনো হয় নাই সামনের নভেম্বরের নয় তারিখে একুশ বছর হবে।'

'একুশ বছর ধরে আপনি রাতে ঘুমান না?'

'জি না।'

'দিনে ঘুমান তো? না কি দিনেও ঘুমান না?'

'সূর্য উঠার পর ঘন্টা খানিক ঘুম হয়। তাও সবদিন না। যেমন ধরেন গত শনিবারে আর সোমবারে দিনে সামান্য ঘুম হয়েছে।'

'ডাক্তার দেখিয়েছেন?'

'ডাক্তার কবিরাজ সবই দেখিয়েছি। টোটকা চিকিৎসা করিয়েছি। যে যা করতে বলেছে করেছি। একজন বলল বাদুড়ের মাংস খেতে। বাদুড়ও তো রাতে ঘুমায় না কাজেই বাদুড়ের মাংস খেলে বিষে বিষক্ষয় হবে।'

'বাদুড়ের মাংস খেয়েছেন?'

'জি। বাদুড় ধরাতো মুশকিল। আমাদের গ্রামের এক ভাঙা মন্দির থেকে তিনটা বাদুড় ধরেছিলাম। আমি ধরি নি— জিতু বলে একটা ছেলে দশ টাকার বিনিময়ে ধরে দিয়েছিল। কেউ রান্না করতে চায় না। শেষে আমি নিজেই রান্না করলাম। রান্না তো না তেল মশলা দিয়ে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করেছি।'

'খেতে কেমন ছিল?'

'অত্যন্ত সুস্বাদু। মাংসটাও সুন্দর লাল। টকটকে মাংস। নরম। প্রথমে খুবই ঘেন্না লাগছিল। একটুকরা মুখে দেবার পর ঘেন্না কেটে গেল। চেটেপুটে খেয়েছি। তবে যে কারণে খেয়েছি তার কিছু হয় নি। ঘুম হয় নি।'

জয়নাল সাহেব সিগারেট ধরালেন। অনিদ্রার রোগী রাতে কথা বলার সঙ্গী পেলে আনন্দে আত্মহারা হয়। ভদ্রলোকের তাই হয়েছে। মনের আনন্দে কথা বলে যাচ্ছেন।

'বুঝলেন ভাই সাহেব রাতে ঘুম হয় না। নিজের ঘরে আর কতক্ষণ বসে থাকা যায়। রাস্তায় গিয়ে যে হাঁটাহাঁটি করব সেই উপায় নেই— এরা রাত বারটার সময় কোলাপসিবল গেট বন্ধ করে দেয়। মেসের বারান্দায় হাঁটাহাঁটি করি। আপনার ঘর সব সময় খোলা থাকে। একরাতে টুক করে আপনার ঘরে ঢুকে পড়লাম সেই থেকে অভ্যাস হয়ে গেল। বাংলা প্রবচন আছে না— "জ্বর হইয়া বউ লেংটা হইল, সেই থাইক্যা বউ এর অভ্যাস হইল।" এই প্রবচনটা শুনেছেন?'

'জি- - না।'

'এটা আমাদের নেত্রকোনা অঞ্চলের প্রবচন। একটু অশ্লীল। নিজগুণে ক্ষমা করে নেবেন। প্রবচনটার অর্থটা পরিষ্কার করে না বললে বুঝবেন না। গ্রামের এক বউ-এর প্রচণ্ড জ্বর উঠেছে। জ্বরের ঘোরে মাথা ঠিক নাই গায়ের কাপড় চোপড় খুলে ফেলেছে। সবার সামনেই পুরো নগ্ন। এর থেকে তার হয়ে গেল অভ্যাস। কথা নাই বার্তা নাই ফট করে কাপড় খুলে নগ্ন হয়ে পড়ে। সার কথা

হল মানুষ অভ্যাসের দাস। প্রবচনটা এখন কি বুঝতে পেরেছেন?'

'জি বুঝতে পারছি।'

'আপনার সঙ্গে কথা বলে খুবই ভালো লাগছে। রাতের পর রাত একা বসে থাকি। গল্পের বই পড়ার অভ্যাস নাই। তাও পড়ার চেষ্টা করেছি। ভালো লাগে না। শরৎচন্দ্রের একটা বই কিনলাম। দোকানদার বলেছে খুবই ভাল বই— দেনা পাওনা নাম। এতবার সেই বই পড়েছি প্রায় মুখস্থ হয়ে গেছে। যেমন ধরেন শুরুটা বলি—

'চন্ডীগড়ের চন্ডী বহু প্রাচীন দেবতা। কিংবদন্তী আছে রাজা বীরবাহুর কোন এক পূর্বপুরুষ কি একটা যুদ্ধে জয় করিয়া বারই নদীর উপকূলে এই মন্দির স্থাপিত করেন, এবং পরবর্তীকালে ইহাকেই আশ্রয় করিয়া চন্ডীগড় গ্রামখানি ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছিল।... আরো বলব?'

'না আর বলতে হবে না।'

'খবরের কাগজ পড়ি এতে কিছু সময় যায়। খবরের কাগজের কিছুই বাদ দেই না। সবই পড়ি। দুইবার করে পড়ি। জেনারেল নলেজের পরীক্ষায় কেউ আমার সঙ্গে পারবে না। বলেন দেখি গৌতমবুদ্ধের জন্ম কোথায় হয়েছে? গত পরশু পেপারে ছিল। বৈশাখী পূর্ণিমা ছিল তো সেই উপলক্ষে একটা আর্টিকেল ছাপা হয়েছে— আমি তিনবার পড়লাম। বলতে পারবেন গৌতম বুদ্ধের জন্ম কোথায় হয়েছে। একটা হিনটস দেই প্রথম অক্ষর 'ল'।

'বলতে পারলাম না।'

'লুম্বিনীর শালবনে।'

'মৃত্যু কোথায় হয়েছে জানেন?'

'না।'

'মৃত্যুও হয়েছে বৈশাখী পূর্ণিমায়। শালবনে। তবে লুম্বিনীর শালবনে না— কুশিনারার শালবনে। মহাপুরুষদের জন্ম মৃত্যু একই দিনে হয়। ভাই সাহেব উঠি অনেক বিরক্ত করলাম। কিছু মনে করবেন না। জানি আপনি কিছু মনে করেন নাই। মনে করলে আমার এত কথা শুনতেন না। অনেক আগেই আমাকে গেট আউট করে দিতেন। আপনি সেটা করেন নাই। সিগারেটের প্যাকেট আগায়ে দিয়েছেন। জাপানি একটা প্রবাদ আছে— "একটা আন্তরিক কথা দিয়ে তিনটা শীতকাল উষ্ণ করা যায়।" আপনার সঙ্গে কথা বলে জাপানি প্রবাদটার কথা মনে পড়ল। ছাত্রজীবনে আমার প্রবাদ সংগ্রহের বাতিক ছিল। প্রবাদ, প্রবচন লিখে

তিনশ পৃষ্ঠার একটা খাতা ভরতি করেছিলাম। বাসার লোকজন ভুলক্রমে পুরোনো খবরের কাগজের সঙ্গে খাতাটা বিক্রি করে ফেলে। জীবনে এত দুঃখ পাই নাই। ভাইসাব যাই?

আমি বললাম, আচ্ছা যান।

ভদ্রলোক দরজা পর্যন্ত গিয়ে আবার ফিরে এসে বললেন, আপনার ঘুম ভাঙায়েছি। যদি অনুমতি দেন তা হলে ঘুম পাড়ায়ে দিয়ে যাই।

'কীভাবে ঘুম পাড়াবেন?'

'মাথা বানিয়ে দিব। চুল টেনে দিব। নাপিতের কাছ থেকে শিখেছি। নাপিতের নাম নেক মর্দ। নাম শুনে মনে হয় হিন্দু। আসলে মুসলমান। অতি ভালো মানুষ। আমাকে যত্ন করে শিখিয়েছেন।'

'কী শিখিয়েছেন? মাথা বানানোর কৌশল?'

'উনার কাছে চুল কাটাও শিখেছি। ভবিষ্যতে চুল কাটার প্রয়োজন হলে আমাকে বলবেন। আমার কাছে কাচি চিরুনি সবই আছে।'

'জি বলব।'

'এখন যদি অনুমতি দেন, মাথা বানায়ে দেই। পাঁচ মিনিটের মধ্যে ঘুম পাড়ায়ে দিব ইনশাল্লাহ। মাথার নিচে দুটা বালিশ দিয়ে শুয়ে পড়েন।'

আমি আপত্তি করলাম না। মাথার নিচে দুই বালিশ দিয়ে শুয়ে পড়লাম। শুরু হয়ে গেল মাথা মালিশ। জয়নাল সাহেব আগ্রহ নিয়ে বললেন, ভাই সাহেব কেমন লাগছে?

আমি বললাম, ভালো।

'শরীর ছেড়ে দেন। যত ছাড়বেন তত আরাম পাবেন।'

আমি শরীর ছেড়ে দিলাম। জয়নাল সাহেব ফিসফিস করে বললেন, আমি কী কথা বলছি, না বলছি মন দিয়ে শোনার কোনো দরকার নাই। এক কান দিয়ে ঢুকাবেন আরেক কান দিয়ে বের করে দেবেন।

আমি বললাম, আচ্ছা।

'সবচে আরামের মালিশ হল চোখ মালিশ। এটা দিব সবার শেষে। তখন ঘুম চলে আসবে। আরাম লাগছে না ভাই সাহেব?'

'লাগছে।'

'শরীরের আরামকে অনেকে খুব খারাপ চোখে দেখে। এটা ঠিক না। শরীর হল আত্মার ঘর। ঘর আরাম পেলে আত্মা আরাম পাবে ঠিক না ভাই?'

'হ্যাঁ ঠিক।'

'মেসের সবার কি ধারণা জানেন?'

'না জানি না।'

'মেসের সবার ধারণা আপনার পাওয়ার আছে।'

'কী আছে?'

'পাওয়ার আছে।'

'পাওয়ার আছে মানে কী?'

'কিছু কিছু মানুষকে আল্লাপাকে পাওয়ার দিয়ে পাঠান। তারা যা ইচ্ছা করে তাই হয়।'

'আপনার ধারণা আমার পাওয়ার আছে?'

'আমার কোনো ধারণা না— লোকজন বলে।'

'আপনি বিশ্বাস করেন না?'

'আমি বিশ্বাসও করি না, আবার অবিশ্বাসও করি না। আল্লাহ্ কখন কাকে কী দেন বলা মুশকিল। কে জানে হয়তো আপনাকে দিয়েছে। এমন তো না যে আপনাকে কিছু দিলে আল্লাহর টান পড়ে যাবে। উনার হল অফুরন্ত ভাণ্ডার।'

'আল্লাহ্ আমাকে কিছুই দেন নাই। তবে এখন আপনার মাধ্যমে আরাম দিচ্ছেন। খুবই আরাম পাচ্ছি। মাথা মালিশটাকে তো আপনি একেবারে শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে গেছেন। চোখের কাজটা কখন শুরু করবেন?

'দেরি আছে। কপাল ম্যাসাজ হবে, তারপরে ভুরু— তারপরে চোখ। ঘুম পাচ্ছে না?'

'হ্যাঁ পাচ্ছে। খুবই ঘুম পাচ্ছে। কষ্ট করে জেগে আছি।'

'কষ্ট করে জেগে আছেন কেন?'

'ঘুমিয়ে পড়লে তো আর আরামটা পাব না। যতক্ষণ জেগে থাকব ততক্ষণই আরাম। যে নাপিতের কাছ থেকে এই কাজ শিখেছেন তার নামটা যেন কী?'

'নেকমর্দ।'

'বেঁচে আছেন এখনো?'

'জি না উনার ইন্তেকাল হয়েছে।'

'কবর হয়েছে কোথায়?'

'চাঁদপুরে।'

'মাজার জিয়ারত করতে যান না?'

'জি না।'

'যাওয়া দরকার। এবং কবর বাঁধানোর ব্যবস্থা করাও দরকার। শ্বেত পাথরে লেখা থাকবে—

মহান মাথা মালিশ শিল্পী
নেকমর্দ

বুঝতে পারছি আমার কথা জড়িয়ে যাচ্ছে। ঘুম চলে আসছে। ওস্তাদ নেকমর্দের যোগ্য উত্তরসুরি তাঁর চোখের কাজ শুরু করেছেন। মনে হচ্ছে চোখের পাতার উপর দিয়ে ভেজা পায়ে পিঁপড়া হেঁটে যাচ্ছে। পিঁপড়াদের মধ্যে দু-একটা আবার দুষ্ট প্রকৃতির। এরা পথ চলতে চলতে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে কুটুস করে কামড় দিচ্ছে। সেই কামড়েরও আরাম। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়— "সুখের মতো ব্যথা।" মূল কবিতাটা মনে করার চেষ্টা করছি। ঘুমে মাথা এলোমেলো হয়ে আসছে— ভালো মনে আসছে না—

কমল ফুল বিমল সেজখানি
নিলীন তাহে কোমল তনুলতা
মুখের পানে চাহিনু অনিমেষে
বাজিল বুকে সুখের মতো ব্যথা।

'হিমু। এই হিমু।'

মাথা থেকে কবিতা উধাও হয়ে গেল— হঠাৎ মনে হল জয়নাল সাহেব আমার চোখের পাতায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন না হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন আমার বাবা। তাঁর গায়ের গন্ধ পর্যন্ত পাচ্ছি। অর্থাৎ আমি ঘুমিয়ে পড়েছি। গভীর ঘুম। অবচেতন মনের যে অংশে বাবা ঘাপটি মেরে বসে ছিলেন। সেই অংশ থেকে তিনি উঠে এসেছেন। কিছু কঠিন কঠিন কথা তিনি এখন শুনাবেন।

'হিমু!'

'জি!'

'বেহায়ার মতো মাথা পেতে শুয়ে আছিস তোর লজ্জা লাগছে না। ছোটলোকদের মতো মাথা মালিশ করাচ্ছিস?'

'লজ্জা লাগার কী আছে? শরীর আরাম পাচ্ছে। শরীরে বাস করছে আত্মা। কাজেই আত্মাও আরাম পাচ্ছে।'

'ফাজলামি করছিস? তোকে এত দিন কী শিখিয়েছি? যা শিখিয়েছি সব ভুল মেরে বসে আছিস?'

'বাবা ঘুমুতে দাও। আরাম করে ঘুমুচ্ছি।'

'গৌতম বুদ্ধ কোথায় জন্মেছিলেন?'

'লুম্বিনীর শালবনে।'

'হয়েছে। গৌতম বুদ্ধের অনেক বাণী তোকে শিখিয়েছিলাম। মনে আছে?'

'না।'

'সব ভুল মেরে বসে আছিস?'

'বসে নেই বাবা শুয়ে আছি।'

'আমার সঙ্গে আবৃত্তি কর— '

"আত্তাহি অওনো নাথো
কোহি নাথো পরসিয়া।"

আমি বিড়বিড় করে আবৃত্তি করলাম। বাবা বললেন— 'এর অর্থটা বলে দেই— "নিজের প্রদীপ নিজেকেই জ্বালাতে হবে।"

আমি বললাম,'হুঁ।'

বাবা বললেন, 'কিছু না বুঝেই বলে ফেললি হুঁ।'

'না বোঝার তো কিছু নেই। নিজের প্রদীপ নিজেকেই জ্বালাতে হবে এটা তো সহজ কথা।'

'মোটেই সহজ কথা না— অতি জটিল কথা। প্রদীপ থাকলেই হয় না। প্রদীপে তেল থাকতে হয়। প্রদীপ জ্বালানোর জন্যে ম্যাচের কাঠি থাকতে হয়। বুঝতে পারছিস?'

'হুঁ। বাবা দয়া করে তুমি যাও। আমাকে কিছুক্ষণ আরাম করে ঘুমুতে দাও। খুব ভোরে আমাকে উঠতে হবে।'

'কেন?'

'ফরিদা খালার বাসায় যেতে হবে? উনি জরুরি খবর পাঠিয়েছেন।'

বাবা দুঃখিত গলায় বললেন, 'ব্যাটা তুই তো সংসারে জড়িয়ে পড়ছিস।

তোকে জরুরি কাজে ডেকে পাঠাচ্ছে। তোর আবার কিসের জরুরি কাজ? খবর্দার তুই যাবি না।

'আচ্ছা যাও যাব না।'

'তোর ফরিদা খালা ঘোর সংসারী মানুষ। তার কাছ থেকে এক শ' হাত দূরে থাকবি।'

'আচ্ছা।'

'এক শ' হাত না, তারচেয়েও বেশি। পাঁচ শ' হাত দূরে থাকবি।'

'আচ্ছা এখন তুমি যাও।'

বাবার আর কোনো সাড়া শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না।

আমি তলিয়ে যাচ্ছি গাঢ় গভীর ঘুমে।



ফরিদা খালা কখনোই আমাকে ধমক না দিয়ে কথা শুরু করতে পারেন না। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন। বাড়ির পুরোনো ড্রাইভার দুদিনের কথা বলে পনেরো দিন পর ফিরে এলে তার দিকে যে দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা হয় সেই দৃষ্টি। তারপর শুরু হয় ধমক। প্রথমেই বাড়ি থেকে বের হয়ে যেতে বলেন। তারপর বলেন— আমার মতো অপদার্থ, অকর্মণ্য মানুষ তিনি তাঁর জীবনে দেখেন নি। আমি এখনো কেন বাংলাদেশ চীন-মৈত্রী সেতু থেকে লাফ দিয়ে বুড়িগঙ্গায় পড়ছি না তা জানতে চান। তারপর এক সময় তাঁর রাগী রাগী মুখ হাসি হাসি হয়ে যায়। তিনি বলেন— রামছাগলের মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাথা নাড়ছিস কী জন্যে? বোস। কী খাবি চা না সরবত। বরফ দিয়ে লেবুর এক গ্লাস সরবত খা। কিছু ভিটামিন সি শরীরে যাক। চা খেয়ে খেয়ে শরীরের কি অবস্থা করেছিস খেয়াল আছে? আয়নায় নিজেকে কখনো দেখিস? দেখলে তো ওয়াক থু করে বমি করে আয়না নষ্ট করে ফেলতি। ঝামা দিয়ে ঘসে তোকে একদিন গোসল করাতে পারলে আমার মনটা শান্ত হত। তারপর বড় করে নিশ্বাস নিয়ে বলেন— ওই মরজিনা, মরজিনা হিমুকে লেবুর সরবত বানিয়ে দে। মরজিনা এ বাড়ির কাজের মেয়ে অনেকদিন থেকে আছে। খালা কথায় কথায় বলেন এই বাড়িতে মরজিনার নাম যতবার নেওয়া হয় আল্লাহ্‌র নামও ততবার নেওয়া হয় না।

খালা যখন মরজিনাকে ডাকাডাকি শুরু করেন তখন বুঝতে হবে তাঁর রাগ পড়ে গেছে। এই পর্যায়ে আসতে মাঝে মাঝে অল্প সময় লাগে আবার মাঝে মাঝে দীর্ঘ সময় লাগে। আজ যেমন লাগছে। খালার রাগ বাড়ছেই। তাঁর গালাগালির মধ্যে আজ নতুন নতুন জিনিস যুক্ত হচ্ছে।

'তুই বদ্ধ উন্মাদ এটা কি তুই জানিস? উন্মাদদের গা থেকে 'রে' বের হয়। এই 'রে'-এর আশপাশে যারা থাকে তারাও উন্মাদ হয়। তোর গা থেকে যে 'রে' বের হয় এটা তুই জানিস? যে কোনো সুস্থ মানুষ তোর সঙ্গে এক সপ্তাহ থাকলে অসুস্থ হয়ে পড়বে। কেউ যদি গলা টিপে তোকে মেরে ফেলে তা হলে তার বেহেশতে নসিব হবে এটা কি তুই জানিস?'

খালা চিৎকার করেই যাচ্ছেন— আমি যথারীতি দাঁড়িয়ে আছি। লেবুর সরবত প্রসঙ্গ কখন আসে তার জন্যে অপেক্ষা করছি। আর লক্ষ করছি আঠারো উনিশ বছরের একটা অপরিচিত মেয়ে খুবই কৌতূহলী হয়ে পাশের ঘর থেকে মুখ বের করে আমাকে দেখছে এবং খালাকে দেখছে। চোখে চোখ পড়া মাত্র চট করে মাথা সরিয়ে নিচ্ছে। মেয়েটাকে দেখে মনে হচ্ছে সে খালার ব্যাপারে লজ্জায় মরে যাচ্ছে। একবার সে খালার দিকে তাকিয়ে করুণ গলায় বলল— প্লিজ প্লিজ।

খালা তার দিকে তাকিয়ে কড়া গলায় বললেন— আমাদের কথার মধ্যে নাক গলাবে না। প্লিজ প্লিজ বলবে না। তুমি তোমার মতো থাক।

তারপর আবারো হেভি মেশিনগান চালু করলেন— কত লোক ট্রাকের নিচে পড়ে মারা যায়— তুই কেন মারা যাচ্ছিস না? তুই তো রাস্তাতেই থাকিস। কোনো ট্রাক তোকে ধাক্কা দিয়েছে এই খবরটা শুনলেই আমি দশটা ফকির খাওয়াতাম। ফকির আমার খবর দেওয়াই আছে। আসবে আর খিচুড়ি খেয়ে চলে যাবে।

বলতে বলতে খালা বাথরুমে ঢুকলেন। তাঁর মাথায় নিশ্চয় রক্ত উঠে গেছে। মাথায় পানি ঢালা হবে।

অপরিচিত মেয়েটা এই সুযোগে ঘরে থেকে দ্রুত বের হয়ে এসে ফিস ফিস করে বলল— আন্টির অতি নিম্নমানের 'আচরণবিধির' জন্যে আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি। এবং দুঃখ প্রকাশ করছি। আমার ধারণা তিনি কিঞ্চিৎ অসুস্থ। হাইপার টেনশনঘটিত ব্যাধির রোগীরা এরকম আচরণবিধি করে।

মেয়েটার কথা শুনেই বোঝা যাচ্ছে— এই দেশের মেয়ে হলেও দেশের সঙ্গে এর সম্পর্ক নেই। বড় হয়েছে বিদেশে। 'আচরণবিধি' পত্রিকার ভাষা। বাংলাদেশের কোনো মেয়ে কথোপকথনে আচরণবিধি বলবে না। আমরা বিদেশীদের সঙ্গে ইংরেজিতে কথা বলার সময় যেমন একটু ভয়ে ভয়ে থাকি ইংরেজিটা ঠিক হল কি না, মনে মনে বাংলা থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করে নিই এই মেয়েও তাই করেছে। সে প্রথমে কথাগুলি ইংরেজিতে গুছিয়ে নিয়ে পরে বাংলায় অনুবাদ করছে। বাক্যগুলি দ্রুত বলছে না। থেমে থেমে ভেঙে ভেঙে বলছে।

বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে মেয়েটির চেহারা এবং পোশাকআশাক দেখে মনে হচ্ছে মফস্বলের মেয়ে বাবার সঙ্গে চাঁদপুর থেকে ঢাকায় বেড়াতে এসেছে।

চিড়িয়াখানা দেখবে, আহসান মঞ্জিল দেখবে। বাড়ি ফেরার আগে আগে শাড়ি কিনবে, ডালা থেকে স্যান্ডেল কিনবে। মেয়ের বাবা স্টুডিওতে মেয়ের কিছু ছবিও তুলবেন। বিয়ের সময় এইসব ছবি কাজে লাগবে। বরপক্ষকে এইসব ছবি পাঠানো হবে। এমন শান্ত এবং কোমল চেহারার মেয়ে আমি অনেকদিন দেখি নি। এ ধরনের মেয়েদের একটা নাম আছে— অশ্রুকন্যা। এদের চোখে সব সময় জল ছলছল করে। তবে এরা প্রায় কখনোই কাঁদে না কিন্তু এদের দেখেই মনে হয় এরা কাঁদার জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছে।

'আপনি বরঞ্চ চলে যান। ইহাই হবে উভয় পক্ষের জন্যে কল্যাণকর।'

আমি মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বললাম, খালা সরবত খেতে বললেই সব ঠিক হয়ে যাবে। এক্ষুনি মরজিনাকে ডেকে সরবতের কথা বলবেন। আমি তার জন্যে অপেক্ষা করছি।

'সরবত খেতে বলবেন কেন?'

'এটাই উনার নিয়ম। অনেকক্ষণ রাগারাগি করে তারপর স্বাভাবিক হয়ে যান। ভালো কথা তুমি কে?'

'আমি আপনার খালার দূর সম্পর্কের নিস। আমার নাম আশা।'

'তুমি কি দেশের বাইরে থাক?'

'জি। আমি নিউজার্সিতে থাকি। এবার হাইস্কুল পাস করেছি। ইউনির্ভাসিটিতে ঢুকবো। ইউসিএল এ সুযোগ পেয়েছি।'

'প্রথম বাংলাদেশে এসেছ?'

'খুব ছোটবেলায় একবার এসেছিলাম। কিছু মনে নেই। আপনি কথা বলে সময়ের অপচয় না করে অতি দ্রুত 'নিষ্কৃতি' হয়ে যান। আমার ভয় লাগছে।'

'অতি দ্রুত নিষ্কৃতি হয়ে যাবার কোনোই দরকার নেই। দেখবে এক্ষুনি সব ঠিক হয়ে যাবে।'

কথা শেষ হবার আগেই খালা বের হলেন। তাঁর মাথা ভেজা। অর্থাৎ মাথায় পানি দেওয়া হয়েছে। মাথায় পানি দেওয়ায় তেমন লাভ হয়েছে বলে মনে হল না। মুখ থম থম করছে। চোখ লাল। খালা আগের মতোই হুঙ্কার দিয়ে বললেন— তোকে খুব কম করে হলেও দশবার বলেছি সকাল আটটার আগে আসবি। আমার খুব জরুরি দরকার। যেহেতু সকাল আটটায় আসতে বলেছি— তুই ইচ্ছা করে এলি সাড়ে এগারোটায়। আর কিছু না একটা ভাব দেখালি। যদি বলতাম দুপুরে আসিস তা হলে আসতি সকাল সাতটায়। ভাব

না ধরলে আলাদা হওয়া যায় না। প্রমাণ করতে হবে না— আলাদা। আমাদের বিখ্যাত হিমু সাহেব। ঢাকার রাজপথ পর্যটক। রামছাগলের মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাথা নাড়িস না। তুই ল্যাম্পপোস্ট না যে সারাক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। বোস। সরবত খাবি?

'না।'

'তা কেন খাবি? শরীরের উপকার হয় এমন কিছু খেলে তুই যে আলাদা একটা প্রমাণ হবে কেন? শরীর পুরোপুরি নষ্ট হয় এমন কিছু খা। গাঁজাটাজা খা। গাঁজা ধরেছিস না?'

'এখনো ধরি নি।'

'দেরি করছিস কেন ধরে ফেল। আর ধরার দরকারও নেই। গাঁজাখোরদের আশপাশেই তো থাকিস। ওতেই ভোজন হয়ে যায়।'

খালা আমার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা আশার দিকে তাকিয়ে বললেন— হিমুকে বেশি করে লেবু দিয়ে একগ্লাস লেবুর সরবত বানিয়ে দে। রোদে রোদে ঘুরে, ওর ভিটামিন সি খুবই দরকার।

আশা বিস্মিত চোখে আমার দিকে তাকাচ্ছে। তার ঠোঁটের কোণায় চাপা হাসির আভাস। তাকে দেখে মনে হচ্ছে প্রচণ্ড ভয়ে সে অস্থির হয়েছিল। হঠাৎ সব ভয় কেটে গেছে। অন্ধকার ঘরে ঢুকে পড়েছে ঝলমলে সূর্যের আলো।

আমি বেতের সোফায় বসেছি। খালা বসেছেন আমার সামনে। টাওয়েল দিয়ে মাথার ভেজা চুল শুষছেন। তাঁর চোখ মুখ স্বাভাবিক হয়ে গেছে। তিনি বললেন— আসতে দেরি করলি কেন?

'রাতে ঘুম ভালো হয় নি। ঘরে চোর ঢুকে পড়েছিল। চোরের সঙ্গে গল্পগুজব করতে গিয়ে দেরি হয়ে গেল।'

'চোরের সঙ্গে গল্পগুজব করতে দেরি হল?'

'হ্যাঁ।'

'ওকে চা বিসকিট খাওয়ালি।'

'চা খাওয়াই নি বিসকিট খাইয়েছি।'

'উদ্ভট অজুহাত আমাকে দিবি না হিমু। অসহ্য।'

'আচ্ছা যাও দেব না।'

'আটটার সময় তোর আসার কথা। তুই আসছিস না। আশা হয়ে গেল অস্থির। বাঙালি মেয়ে হলেও সারাজীবন মানুষ হয়েছে বিদেশে। ঘড়ির কাঁটা

ধরে চলা হল এদের অভ্যাস।'

'আমার আসার সঙ্গে এই বিদেশিনীর অস্থির হবার সম্পর্কটা কী?'

'সম্পর্ক আছে। এই মেয়ে এক মাসের জন্যে বাংলাদেশে এসেছে। এই একমাস সে বাংলাদেশে ঘুরবে। ছবিটবি তুলবে তারপর ফিরে গিয়ে বই লিখবে। বই এর নামও ঠিক হয়ে আছে Discovering Bangla! '

'তার বই লেখার দরকার কী?'

'তার বই লেখার দরকার কী সেটা সে জানে। আমি সেটা তাকে জিজ্ঞেস করি নি। বেচারি শখ করে এসেছে শখটা মিটলেই হল।'

'আমাকে কী করতে হবে? তাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে বাংলাদেশ দেখাতে হবে?'

'হ্যাঁ। তাতে কোনো অসুবিধা আছে?'

'না অসুবিধা কী? আমি নিজেও বাংলাদেশ দেখি নি। তার সঙ্গে থেকে থেকে আমিও যদি বাংলাদেশ দেখে ফেলি তা হলেতো ভালোই। এক ঢিলে দুই পাখি। One stone two birds.'

'তোর এই কথার মানে কী? তুই বাংলাদেশ দেখিস নি?'

'না।'

'না মানে?'

'যে পোকা আমের ভেতর জন্মে সে কী করে বুঝবে আম কী? আমি তো বাংলাদেশেই ঘোরাফিরা করছি। বুঝব কী করে বাংলাদেশ কী?'

খালা কঠিন কোনো কথা বলতে যাচ্ছিলেন। বলতে পারলেন না। তার আগেই আশা লেবুর সরবত নিয়ে উপস্থিত হল। খালা বললেন— 'আশা এই ছেলের নাম হিমালয়। ডাক নাম হিমু। তুমি যা যা দেখতে চাও এ দেখাবে। তার সঙ্গে তুমি নিশ্চিত মনে ঘুরতে পার। কোনো সমস্যা নেই।'

আশা আমার দিকে তাকিয়ে বলল— 'ধন্যবাদ।'

ধন্যবাদটা তেমন জোরালো হল না। মনে হল সে ঠিক ভরসা পাচ্ছে না।

আমি বললাম, 'চল বের হয়ে পড়ি। সময় নষ্ট করে লাভ নেই।'

আশা খালার দিকে তাকিয়ে বলল, 'উনার সঙ্গে পেমেন্টের ব্যাপারটা শুরুতেই ঠিক করে ফেলা উচিত না? উনি তাঁর সার্ভিসের জন্যে কত চার্জ করবেন এবং মুড অব পেমেন্ট কেমন হবে সেটা জানলে ভালো হত।'

খালা বিরক্ত হয়ে বললেন, 'পেমেন্ট আবার কী? ও তোকে নিয়ে ঘুরবে— যেখানে যেখানে যেতে বলবি নিয়ে যাবে এর আবার পেমেন্ট কী?'

'শুধু শুধু উনার সার্ভিস নেব?'

'অবশ্যই নিবি।'

'উনি তাঁর কাজকর্ম ফেলে আমার সঙ্গে ঘুরবেন?'

'ওর আবার কাজকর্ম আছে নাকি? ওর কাজই হচ্ছে ঘোরা।'

আশা বলল, আমি একটা বাজেট করে রেখেছি প্রতিদিন একশ ইউএস ডলার।

খালার মুখ আবারো রাগি রাগি হয়ে গেল। তিনি মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন— 'এটা আমেরিকা না। এটা বাংলাদেশ। আর হিমু জীবনে কোনোদিন এক শ' ডলার চোখে দেখেছে কিনা সন্দেহ। রিকশা করে বের হলে রিকশা ভাড়া দিবি। ট্যাক্সি করে বের হলে দিবি ট্যাক্সি ভাড়া। ব্যাস ফুরিয়ে গেল।'

আশা কিছু বলল না। চুপ করে গেল। তবে মনে হল খালার কথাটা তার ঠিক মনে ধরে নি। সে এক শ' ডলারের ব্যাপারটা ফয়সালা না করে বের হবে না। আমি আশার দিকে তাকিয়ে গম্ভীর গলায় বললাম— 'তুমি কি ডেইলি পেমেন্ট করবে? না মাসের শেষে একসঙ্গে করবে?'

'আপনার জন্যে যেটা ভালো হয় সেটাই করব।'

'দুপুরে লাঞ্চ, তারপর ধর সন্ধ্যায় চা বিসকিট এই সব খরচ কিন্তু তোমার।'

'অবশ্যই।'

'আমি দশটা-পাঁচটা ডিউটি করব। এরচে' বেশি হলে ওভারটাইম দেবে।'

'অবশ্যই। ওভারটাইম কত হবে সেটা কি আমরা ঠিক করে নেব?'

'ঘণ্টা হিসেবে ওভারটাইম হোক। প্রতি ঘণ্টায় দশ ডলার কি তোমার কাছে খুব বেশি মনে হচ্ছে?'

'না বেশি মনে হচ্ছে না।'

খালা হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে আছেন। মনে হচ্ছে আমার কথাবার্তায় তিনি এতই অবাক হয়েছেন যে নিজে কথা বলতে ভুলে গেছেন। তাকে দেখাচ্ছে মাছের মতো। চোখে পলক পড়ছে না। আমি আশার দিকে তাকিয়ে সহজ ভঙ্গিতে বললাম, 'আজ যেহেতু প্রথম দিন— তা ছাড়া এসেছিও দেরি করে আজ ফ্রি। আজকের জন্যে কোনো চার্জ দিতে হবে না।'

আশা বলল, 'ধন্যবাদ।'

এবারের ধন্যবাদটা জোরালো। আগের মতো অস্পষ্ট না। খালা এখনো একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। তিনি মনে মনে কি ভাবছেন কে জানে।

আশা বলল, 'আমি কি তা হলে তৈরি হয়ে আসবো?'

আমি বললাম, 'অবশ্যই।'

'সঙ্গে কী কী জিনিস নেব?'

'নোট করার জন্যে খাতা কলম, ছবি তোলার জন্যে ক্যামেরা। তাৎক্ষণিকভাবে কথাবার্তা রেকর্ড করার জন্যে ক্যাসেট রেকর্ডার। ছাতা। পানির বোতল। বাসার সঙ্গে যোগাযোগ রাখার জন্যে একটা মোবাইল টেলিফোন। ফাস্ট এইড বক্স কি আছে? একটা ফাস্ট এইড বক্স থাকা দরকার। সুইস নাইফ থাকলে ভালো হয়। নাইলনের দড়ি অবশ্যই নিতে হবে। পৃথিবীতে দড়ির সবচে বেশি ব্যবহার হয় বাংলাদেশে। দেশলাই, মোমবাতি, টর্চ লাইটও নেবে কখন কোনটা কাজে লাগে কে জানে। ও আর একটা ফ্লাস্ক। ফ্লাস্ক ভর্তি গরম চা।'

আশা বলল, 'আমি দশ মিনিটের মধ্যে সব গুছিয়ে নিয়ে আসছি।'

আশা ঘর থেকে বের হবার পর খালা মনে হয় তার কথা বলার ক্ষমতা ফিরে পেলেন। আমার দিকে তাকিয়ে কঠিন গলায় বললেন— 'তুই কী শুরু করেছিস। সত্যি সত্যি তুই টাকা নিবি?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ।'

'পারবি টাকা নিতে?'

'অবশ্যই পারব।'

'অতি সহজ সাধারণ একটা মেয়ে, তুই তো এই মেয়ের মাথা পুরা আউলায়ে দিবি। দরকার নেই আশাকে আমি তোর সঙ্গে ছাড়ব না। দরকার হলে আমি ওকে বাংলাদেশ দেখাব।'

'তাহলে আমি বিদেয় হই।'

খালা দুঃখিত গলায় বললেন— 'বিদেয় হতে চাইলে বিদেয় হ। শুধু এই মেয়েটা যে কত ভালো এটা শুনে যা। সারাজীবন A প্লাস পাওয়া স্টুডেন্ট। A প্লাস পাওয়া স্টুডেন্ট যে কী জিনিস এটা তুই কোনোদিনও বুঝবি না। বোঝার দরকারও নেই। মেয়েটার এক বছর বয়সে তার বাবা মারা যান। মেয়ের মা এক আমেরিকানকে বিয়ে করেন। এখন শুনতে পাচ্ছি সেই বিয়েও ভেঙে গেছে কিংবা যাচ্ছে।

'মহিলা কি তৃতীয় বিয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছেন?'

'হুঁ।'

'বল কী এমন ওস্তাদ মহিলার গর্ভে এমন সাদামাটা সন্তান।'

'সাদামাটা সন্তান মানে? কী বললাম এতক্ষণ এ প্লাস স্টুডেন্ট।'

'ঐ আর কী ওস্তাদ মহিলার গর্ভে পড়ুয়া সন্তান।'

'শুধু পড়ুয়া না, আশা ছবি আঁকতে পারে, গান গাইতে পারে, ফটোগ্রাফিতে প্রাইজ পেয়েছে... ।'

'বল কী গুণাবলি তো ঝরে ঝরে পড়ছে।'

'ঠাট্টা করছিস?'

'ঠাট্টা করব কেন?'

'যার যে সম্মান প্রাপ্য তাকে সে সম্মানটা দিতে হয়। মেয়েটাকে তুই সঙ্গে নিয়ে ঘুরতে পারছিস এটাই তোর ভাগ্য।'

'তুমি যে সব কথা বলছ আমার তো খালা ভয় ভয় লাগছে আমি মেয়েটার প্রেমে পড়ে যাব।'

খালা গম্ভীর গলায় বললেন— 'তোর সেই ভয় নেই। আমি ভয় পাচ্ছি মেয়েটাকে নিয়ে। অতি নরম মনের মেয়ে তোর পাগলামি দেখে তার মাথা আউলায়ে যেতে পারে। মেয়েটার মাথা আউলায় এমন কিছুই করবি না। খবর্দার।'

'অবশ্যই করব না।'

খালা ছোট্ট নিশ্বাস ফেলে বললেন— 'আমি চাচ্ছি খুব ভালো কোনো ছেলে পেলে মেয়েটাকে বিয়ে দিয়ে দিতে। ওর মা'র উপর আমার আর ভরসা নেই। তোর সন্ধানে ভালো ছেলে আছে নাকি রে?

'ভালোছেলে অবশ্যই আছে। তবে গাঁজাখোর টাইপ। অন্তর অত্যন্ত ভালো তবে গাঁজা টাজা খায়... ।'

খালা বড় করে নিশ্বাস নিলেন। কঠিন ধমক দেওয়ার প্রস্তুতি। ধমক দিতে পারলেন না— তার আগেই পুরোপুরি প্রস্তুত হয়ে আশা উপস্থিত হয়েছে। একটু আগের আশার সঙ্গে এই আশার কোনো মিল নেই। কোথায় আগরতলা কোথায় চকিরতলা টাইপ বেমিল। জিনসের প্যান্ট, লাল শার্ট। মাথায় ক্রিকেটারদের টুপির মতো টুপি। তবে টুপির রং সাদা না, নীল। পিঠে হ্যাভারস্যাক ব্যাগ। চুলেও মনে হয় কিছু করেছে যে কারণে বাঙালি মেয়ে বলে এখন আর তাকে মনেই হচ্ছে না। আশা আমার দিকে তাকিয়ে ইংরেজিতে বলল— 'Let us move.'

আমি খালার দিকে তাকিয়ে মোটামুটি ক্ষুদিরামের মতো বললাম— 'বিদায় দে খালা ঘুরে আসি।'

'আশা শোন, আমরা বাংলাদেশ দেখতে বের হয়েছি। অনেক কিছুই আমি

তোমাকে দেখাব। তুমি নোট করবে, ছবি তুলবে, চিন্তা-ভাবনা করবে। এর থেকে এক সময় হয়তো তুমি বাংলাদেশ বের করে ফেলতে পারবে।'

আশা বলল, 'আপনি শিক্ষকের মতো কথা বলছেন কেন? সাধারণভাবে কথা বলুন। আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আপনি আমাকে নিয়ে ক্লাস করতে বের হয়েছেন।'

'ক্লাস করতে বের হয়েছি তো বটেই। আশা শোন একজন পেইন্টারের কথা ভাব। এই পেইন্টারের হাতে সাতটা রং আছে। পেইন্টার সাতটা রং দিয়ে ছবি এঁকেছেন। মনে করা যাক এই সাতটা রঙের মধ্যে একটা বিশেষ রং হল বাংলাদেশ। মনে করা যাক সেই বিশেষ রংটা লাল। আমার কথা কি ফলো করছ?'

'অবশ্যই করছি।'

'পেইন্টার ছবি আঁকতে গিয়ে অনেক রঙের সঙ্গে লাল রংটাও ব্যবহার করবেন। কখনো এই রং নীলের সঙ্গে হবে খয়েরি, কখনো সবুজের সঙ্গে মিশে নীল। তোমাকে যা করতে হবে তা হচ্ছে পেইন্টিং থেকে লাল রং আলাদা করতে হবে। বের করতে হবে কোথায় কোথায় লাল রং অর্থাৎ বাংলাদেশ আছে। কাজটা সহজ না।'

'আপনার বক্তৃতা কি শেষ হয়েছে?'

'হ্যা শেষ হয়েছে।'

'প্রথমে আমরা কী দেখতে যাচ্ছি।'

'প্রথমে আমরা শশা খাওয়া দেখব।'

'শশা খাওয়া দেখব মানে? শশা কি?

'শশার ইংরেজি আমি যতদূর জানি কুকুমবার। আমরা সেই কুকুমবার খাওয়ার দৃশ্য দেখব।'

'বাংলাদেশে এই শশা কি বিশেষভাবে খাওয়া হয়?'

'চল গিয়ে দেখি কীভাবে খাওয়া হয়। তারপর তুমিই বের করবে এর কোনো বিশেষত্ব আছে কি না।'

'আমি আপনার কথাবার্তা কিছুই বুঝতে পারছি না। আমার ধারণা আপনি গাইড হিসেবে কাজ করতে পারবেন না। You are trying to be funny কিন্তু I mean business.

আমি তাকে গুলিস্তানের সামনে নিয়ে এলাম। এখানেই শশা কেটে কেটে বিক্রি হচ্ছে। লোকজন খাচ্ছে। আমি বললাম, আশা শশা খাওয়া দেখলে?

'হ্যাঁ দেখলাম।'

'মনে হচ্ছে দৃশ্যটা দেখে তেমন মজা পাও নি।'

'মজা পাওয়ার কী আছে?'

'কিছুই নেই?'

'না কিছুই নেই। একটা লোক খুবই নোংরা পানিতে শশাটা ধুচ্ছে তারপর পিস করে লবণ মাখিয়ে খেতে দিচ্ছে। এর মধ্যে দেখার কী আছে?'

আমি হাসলাম। আশা বলল, 'হাসছেন কেন?'

আমার মনে হল মেয়েটা রেগে যাচ্ছে। শুরুতে মেয়েটিকে অশ্রুকন্যা বলে মনে হয়েছিল। এখন মনে হচ্ছে সে অশ্রুকন্যা না।

আশা বলল, 'কিছু মনে করবেন না। শশা খাবার দৃশ্য দেখা হয়েছে এখন আমি ঘরে ফিরে যেতে চাই। Enough is enough.'

আমি বললাম, 'আশা দৃশ্যটা তুমি কিন্তু ভালো করে দেখ নি। অর্থাৎ লাল রংটা তুমি আলাদা করতে পার নি। আমি তোমাকে যেটা দেখাতে চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে— শশা অল্প কিছু লোক খাচ্ছে— কিন্তু তাদের ঘিরে আছে অনেক মানুষ। এদের কোনো কাজ কর্ম নেই। এরা গভীর আগ্রহে শশা খাওয়ার দৃশ্য দেখছে। কেউ বসে বসে দেখছে। কেউ দাঁড়িয়ে দেখছে। যেন এটা জগতের অতি আশ্চর্য একটা দৃশ্য।'

আশা চারদিকে তাকাল। তারপর শান্ত গলায় বলল, 'আপনি ঠিকই বলেছেন।'

আমি বললাম, 'এমন না যে এদের খুব শশা খেতে ইচ্ছা করছে বলে এরা ভিড় করে আছে। টাকা নেই বলে খেতে পারছে না। এরা শশা খাওয়ার দৃশ্যটাই আনন্দ নিয়ে দেখছে।'

'আমি যদি তাদের একটা ছবি তুলি তারা কি রাগ করবে?'

'মোটেই রাগ করবে না। খুবই আনন্দ পাবে। বাংলাদেশের মানুষ ছবি তুলতে খুব পছন্দ করে। মনে করো কোনো এক ভদ্রলোকের বাড়িঘর আগুনে পুড়ে যাচ্ছে, সে পাগলের মতো ছোটাছুটি করছে তারমধ্যেও পত্রিকার কোনো সাংবাদিক যদি তাঁর ছবি তুলতে চায় সে কিন্তু হাসি মুখে ছবি তুলবে।'

'সত্যি বলছেন?'

'হ্যাঁ সত্যি বলছি, ১৯৭১ সনে পাকিস্তান আর্মী আমাদের দেশের অনেক মানষকে ফায়ারিং স্কোয়াডে গুলি করে মারে। পাক আর্মীর ফটোগ্রাফার তখন কিছু কিছু ছবিও ক্যামেরায় তুলে। সেইসব ছবিতে অনেককে দেখা গেছে মুখে

হাসি নিয়ে ছবির জন্যে পোজ দিয়েছে।'

'আপনি নিশ্চয়ই বানিয়ে বানিয়ে বলছেন।'

'আমি বানিয়ে বানিয়ে বলছি না।'

'আপনার সব কথা যে আমি বিশ্বাস করছি তা না। এখন বলুন আমরা কোথায় যাব?'

'গর্ত দেখতে যাব।'

'গর্ত দেখতে যাব মানে?'

'টি এন্ড টি বোর্ড একটা গর্ত করছে। প্রায় দু শ' লোক গোল হয়ে বসে গর্ত করা দেখছে। গভীর আগ্রহ এবং আনন্দ নিয়ে দেখছে। কেউ কেউ সকালে এসেছে, থাকবে সন্ধ্যা পর্যন্ত।'

আশা হেসে ফেলল।

আমি তার হাসি দেখে অবাক হলাম। এমন প্রাণময় হাসি অনেকদিন দেখি নি। সে হাসি থামিয়ে ব্যাগ থেকে ক্যামেরা বের করতে করতে বলল, 'আপনি আমাকে ইমপ্রেস করার একটা সূক্ষ্ম চেষ্টা করছেন। ঠিক করে বলুন তো, করছেন না?'

'হ্যাঁ করছি। তুমি যদি আমার কর্মকাণ্ডে ইমপ্রেস না হও তা হলে আমার চাকরি থাকবে না। প্রতিদিন এক শ' ডলার করে পাবার কথা সেটা পাব না। যে কোনো বুদ্ধিমান কর্মচারীর মূল কাজ মুনিবকে খুশি রাখা।'

'আপনার যুক্তি মানলাম। গর্ত দেখতে ইচ্ছা করছে না। গর্ত দেখা ছাড়া আর কী করা যায় বলুন।'

'একজন ভিক্ষুকের ইন্টারভ্যু নিলে কেমন হয়। এক ঢিলে দুই পাখি মারা হবে। ভিক্ষুকের ইন্টারভ্যু নেওয়া হবে আবার আপনার ক্যাসেট প্লেয়ারও পরীক্ষা করা হবে।'

'ক্যাসেট প্লেয়ার পরীক্ষার জন্যে ভিক্ষুকের ইন্টারভ্যু নিতে হবে কেন। আপনার ইন্টারভ্যু নিই।'

'হ্যাঁ নিতে পার। তবে যে ভিক্ষুকের কাছে নিয়ে যাব সে মানুষ হিসেবে খুবই ইন্টারেস্টিং। দার্শনিক।'

'You mean philosopher?'

'হ্যাঁ। বাংলাদেশের বেশিরভাগ ভিক্ষুক শ্রেণী মানুষই দার্শনিক।'

'চলুন যাই।'

'রিকশা নেব না হাঁটতে পারবে?'

'হাঁটতে পারব। আমরা যার কাছে যাচ্ছি তিনি কি আপনার পূর্ব পরিচিত?'

'হ্যাঁ। ইনার নাম বদরুদ্দিন। ইনি ভাড়া খাটেন। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তাঁর ভাড়া হচ্ছে পঞ্চাশ টাকা। তুমিও ইচ্ছা করলে পঞ্চাশ টাকা দিয়ে তাকে ভাড়া করতে পার।'

'আমি আপনার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'পঞ্চাশ টাকা দিয়ে তুমি ডে শিফটের জন্যে তাঁকে ভাড়া করলে। তিনি নিজে হাঁটতে পারেন না। বিয়ারিং দেওয়া চাকা লাগানো একটা বক্সে আধশোয়া অবস্থায় থাকেন। বক্স টেনে টেনে তাঁকে নিয়ে ঘুরতে হয়। বক্স যে টানবে তাকে খাওয়া খরচ বাদ দিয়ে বিশ টাকা দিতে হয়। সব দিয়ে বাকি যা থাকবে সবই, যে ভাড়া করবে তার। চল একটা কাজ করি আমরা বদরুদ্দিনকে এক সপ্তাহের জন্যে ভাড়া করে ফেলি। বৃষ্টি বাদলা না হলে এক সপ্তায় আমাদের মোটামুটি ভাল লাভ থাকবে বলে আমার বিশ্বাস।'

'আপনি ঠাট্টা করছেন? না সিরিয়াসলি বলছেন?'

'মোটেই ঠাট্টা করছি না।'

'আমার তো মনে হচ্ছে আমি একটা খুবই অদ্ভুত এক দেশে উপস্থিত হয়েছি।'

'তুমি মোটেও কোনো অদ্ভুত দেশে উপস্থিত হও নি। ভিক্ষাবৃত্তি আমাদের অতি প্রাচীন প্রথা। এ দেশের সব বড় বড় সাধু সন্তরা ভিক্ষা করেছেন। এখনো এ দেশে একটা সম্প্রদায় আছে ভিক্ষাবৃত্তি যাদের ধর্মের অংশ। কাজেই এই দিকে ভিক্ষুকদের মধ্যে প্রফেশনালিজম তৈরি হয়েছে। তুমি এমন এক দেশ থেকে এসেছ যেখানে প্রফেশনালিজমকে সম্মানের চোখে দেখা হয়। কাজেই ভিক্ষুকদের প্রফেশনালিজকে তুমি তুচ্ছ করবে না এটা আশা করতে পারি।'

আশা বিড়বিড় করে বলল, 'I am so confused.'

বদরুদ্দিনকে খুঁজে বের করতে খুবই সমস্যা হল। নিউ ইস্কাটনের যে বস্তিতে সে থাকত সেই বস্তি হঠাৎ উচ্ছেদ করা হয়েছে বলে বস্তিবাসী চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। বদরুদ্দিনের দুই স্ত্রীর একজন থাকে বাসাবোতে। তার কাছ থেকে সন্ধান নিয়ে সন্ধ্যার আগে আগে বদরুদ্দিনকে খুঁজে বের করলাম। আমি ভেবেছিলাম আশার ধৈর্যচ্যুতি হবে। তা হল না। সে আমার সঙ্গে যথেষ্ট আগ্রহ নিয়ে লেগে রইল।

বদরুদ্দিন মুখ গোমড়া করে বসেছিল। তার মেজাজ অত্যন্ত খারাপ কারণ

গত তিন দিন তার বুকিং হয় নি। পঞ্চাশ টাকা তার রেট। কোনো পার্টিই পঞ্চাশ দিতে চায় না। চল্লিশের উপর কেউ উঠছে না। বদরুদ্দিন থু করে থুতু ফেলে বলল, 'একবার চল্লিশে নামলে উপায় আছে? ভাইজান আপনে বলেন? দাম একবার যদি পড়ে আর তারে উঠানো যায় না। বরং তিন দিন না খায়া থাকব তাও ভালো। এই বিষয়ে আপনের কী বিবেচনা ভাইবা বলেন।'

আমি মাথা চুলকে বললাম, 'বুঝতে পারছি না।'

বদরুদ্দিন বড় করে নিশ্বাস ফেলে বলল— 'আপনে লোকটা যে জ্ঞানী এইটা পরিষ্কার। জ্ঞানী না হইলে হুট কইরা একটা মত দিতেন। জ্ঞানী বইল্যাই সময় নিতাছেন। ভিক্ষা ব্যবসা বড় জটিল ব্যবসা। তার উপরে আমি হইছি ঠিকানা হারা। পুরানা পার্টির কেউ জানেও না আমি কই থাকি?'

আমি বললাম, 'বদরুদ্দিন যাকে সঙ্গে নিয়ে তোমার কাছে এসেছি তাঁর নাম আশা। উনি আমেরিকার নিউ জার্সিতে থাকেন। তোমার সঙ্গে কিছু কথা বলতে চান। যদি তোমার আপত্তি না থাকে।'

বদরুদ্দিন আশার দিকে তাকাল না। বিরক্ত মুখে বলল, 'মন মিজাজ অত্যধিক খারাপ। কী কথা বলব কন? তিন দিন হইয়া গেছে কোনো বুকিং নাই।

আমি বললাম, 'আমরা বুকিং বিষয়েই আলাপ করতে চাই। টানা এক সপ্তাহ বুকিং নিব— দর কমাতে হবে। ডেইলি পঞ্চাশ টাকা অসম্ভব ব্যাপার। ম্যাক্সিমাম চল্লিশ। খাওয়া খরচ নিজের।'

'মাফ করেন। না খাইয়া মরব কিন্তু পঞ্চাশের নিচে এক পয়সা নামব না। আমার একটা ইজ্জত তো আছে? নাকি ইজ্জত নাই?'

'ইজ্জত তো অবশ্যই আছে। তবে পুরা সপ্তাহের জন্যে বুকিং এটা মনে রাখতে হবে। খুচরা রেট আর পাইকারীর রেট কখনো এক হয়?'

বদরুদ্দিন ঝুঁকে এসে বলল, 'ভাইজান শুনেন পুরা ঢাকা শহরে দুই ঠ্যাং নাই ফকিরের সংখ্যা ছিল তের। এর মধ্যে দুই জন চলে গেছে নারায়ণগঞ্জ একজন গেছে ময়মনসিং সদরে এখন আমরা আছি মোট দশজন। দশজনের মধ্যে গান করতে পারে আমারে নিয়া চারজন। আমার রেইট বেশি হবে না?'

'অবশ্যই বেশি হবে। তবে তোমার গানের গলা তো ভালো না।'

'ফকিরের গানের গলা যেমন হয় আমারটাও তেমন— আমিতো আর হেমন্ত না।'

'দেখি আমার গেস্টকে একটা গান শুনাও।'

'না।'

'না কেন?'

'ইচ্ছা করতেছে না।'

আশা বলল, 'আমি কি আপনার একটা ছবি তুলতে পারি?'

বদরুদ্দিন বলল, 'না।'

আশা বলল, 'সব কিছুতেই না বলছেন কেন?'

বদরুদ্দিন থু করে একদলা থু তু ফেলে বলল, 'দুই বেলা না খাইয়া থাকলে আপনের মুখ দিয়া কোনো শব্দ বাইর হইত না। আমি তো তাও না বলতেছি। অনেক বিরক্ত করেচেন। এখন যান সাংবাদিকের সাথে আমি কথা বলি না।'

'সাংবাদিকের সঙ্গে কথা বলেন না কেন?'

'এরা উল্টা পাল্টা সংবাদ ছাপে। ছবি দিয়া একবার আমার সংবাদ ছেপেছে সেখানে লিখেছে আমার তিন বিবাহ। ভিক্ষার রোজগারে আমি নাকি তিন বউ পালি।'

'আপনার বিয়ে কয়টি।'

'দুই বিবাহ। তবে দুইটাই তালাক হয়ে গেছে। সংসার করতে যদি ইচ্ছা করে তা হলে করতে পারি। বর্তমানে সংসার ধর্মে মন নাই।'

বদরুদ্দিন অন্যদিকে ফিরে সিগারেট ধরাল তাকে দেখে মনে হচ্ছে বর্তমানে তার যে শুধু সংসার ধর্মে মন নেই তা না, কথাবার্তা বলতেও মন নেই। আমি আশার দিকে তাকিয়ে বললাম, 'আজকের দিনের মত বাংলাদেশ দেখা বন্ধ করলে কেমন হয়?'



হিমু,

তোর ব্যাপারটা কি বলবি? প্রথম দিন এসে এই যে ডুব দিলি আর খোঁজ নেই। এদিকে আশা অস্থির হয়ে আছে। ওর ধারণা তোর অসুখবিসুখ করেছে। আমি তাকে বলার চেষ্টা করেছি অসুখবিসুখ কিছু না— তোর স্বভাবই হল ডুব মারা। তুই তোর স্বভাব মতো ডুব মেরেছিস।

আশাও তোকে একটা চিঠি দিয়েছে। খামের মুখ বন্ধ বলে কী লিখেছে আমি পড়তে পারি নি। তুই আসার সময় অবশ্যই চিঠিটা সঙ্গে নিয়ে আসবি। আমি পড়ব। মেয়েটা কেন এত বড় চিঠি লিখল জানা দরকার।

তুই অবশ্যই অবশ্যই চিঠি পাওয়া মাত্র চলে আসবি। তোকে আল্লাহর দোহাই লাগে। আমার কথা না শুনলে তোর ওপর আল্লাহর গজব পড়বে।

ইতি
তোর খালা

খালার চিঠি শেষ করে মুখবন্ধ খাম খুললাম। খামের উপর লেখা HEEMO, হিমু নামের ইংরেজি বানান কি HEEMO?

আশা চিঠিটা লিখেছে ইংরেজিতে। সম্বোধন হল— Dear Sir. চিঠির ভঙ্গি এ রকম যেন স্কুলের ছাত্রী তার একজন শিক্ষককে লিখছে। চিঠিটা বাংলায় অনুবাদ করলে এরকম দাঁড়ায়—

প্রিয় মহোদয়,
ওই দিন আপনার সঙ্গে ঘুরে খুব আনন্দ পেয়েছি। বাড়িতে ফিরে অনেক চিন্তা করলাম— 'কেন আনন্দ পেয়েছি?' কিছু বের করতে পারি নি। আপনি খুব মজা করে কথা বলেছেন এটা একটা আনন্দের ব্যাপার হতে পারে। কিন্তু মজা করে কথা তো অনেকেই বলে। একজন মজার মানুষের সঙ্গে কিছু সময় কাটিয়েছি

এটাই কি আমার আনন্দের উৎস? নাকি এর বাইরেও কিছু আছে?

পরদিন খুব আগ্রহ নিয়ে আপনার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। কিন্তু আপনি আসেন নি। দুপুরে আপনার খালা বললেন— আপনি আসবেন না। কিছু দিন পরপর কাউকে কিছু না বলে আপনি ডুব দেন। তখন নাকি আপনার ছায়াও বলতে পারে না আপনি কোথায়। আপনার স্বভাবই নাকি এ রকম।

আমি জানতে চাইলাম, স্বভাব এরকম মানে কী?

উনি বললেন, হিমু যেই বুঝে কেউ তার জন্যে অপেক্ষা করছে ওম্নি সে ডুব মারে। ও বুঝে ফেলেছে তুই তার জন্যে অপেক্ষা করছিস। কাজেই ডুব মেরেছে।

আমি বললাম, প্রতিদিন উনি এক শ' ডলার করে পাবেন এটা তার কাছে কোনো ব্যাপার না?

উনি বললেন, দৈনিক এক হাজার ডলারও তার কাছে কোনো ব্যাপার না। কারণ সে হল— হিমু।

সে 'হিমু' এটা বলে আপনার খালা এক ধরনের অহঙ্কার বোধ করলেন। আমি এতেই সবচে' অবাক হয়েছি। মানুষ নিজেকে নিয়ে অহঙ্কার করে এটা স্বাভাবিক। প্রকৃতি জীব জগতের মধ্যে মানুষকে অহঙ্কারী করে পাঠিয়েছে। অস্বাভাবিক ব্যাপার হল একজন মানুষ যখন অন্য একজনকে নিয়ে অহঙ্কার করে। আপনি কি জানেন যে আপনি সেই অসীম ভাগ্যবানদের একজন?

আপনি পরদিনও এলেন না। আপনার খালা হাসি মুখে বললেন— ও আর আসবে না। যেন আপনার না আসাটা আনন্দময় কোনো সংবাদ। আমি বললাম, উনি যদি না আসেন আমি যাব তাঁর কাছে। আপনার খালা বললেন, ও কোথায় থাকে না-থাকে তার কি কোনো ঠিক আছে নাকি।

আমি বললাম, উনার কোনো ঠিকানা নেই? আপনার খালা খুবই আনন্দিত গলায় বললেন— ওর ঠিকানা থাকলে তো কাজই হত।

'উনি থাকেন কোথায়?'

'ও কোথাও স্থির হয়ে থাকে না। আজ এখানে কাল ওখানে। ভোজনং যত্র তত্র শয়নং হট্ট মন্দির।'

শুনে আমার খুবই ইন্টারেস্টিং লাগছে। আমেরিকায় 'Hobo' সম্প্রদায় বলে একটা গোষ্ঠী আছে। এরাও ইচ্ছা করে সব ঠিকানা নষ্ট করে ঠিকানা বিহীন মানুষে পরিণত হয়েছে। আজ এখানে, কাল ওখানে সময় কাটাচ্ছে। ট্রেনে করে ঘুরেছে। স্লিপিং ব্যাগ পেতে ফুটপাতের এক কোণায় ঘুমিয়ে পড়ছে। ওদের

জীবনযাত্রা আমাকে খুব মুগ্ধ করেছিল। আমি ওদের প্রচুর ছবি তুলেছি। কিছু স্লাইড আমার কাছে আছে। আপনাকে আমি দেখাব।

কিন্তু তার জন্যে আপনার সঙ্গে আমার দেখা হওয়া প্রয়োজন। আপনার উপর জোর খাটানোর কোনো ক্ষমতা আমার নেই। আমি শুধুই অনুরোধ করছি টেলিফোনে হলেও আমার সঙ্গে কয়েক মিনিট কথা বলার জন্যে। কারণটা স্পষ্ট করি আমার ধারণা আপনি কোনো কারণে আমার উপর বিরক্ত হয়েছেন। কেউ আমার উপর বিরক্ত এটা ভাবতেও আমার কাছে খারাপ লাগে। আশপাশের মানুষের মনে আনন্দের অনুভূতি সৃষ্টির ক্ষমতা হয়তো আমার নেই, তাই বলে তাদের বিরক্ত করব কেন? কারণটা স্পষ্ট করলাম। নয়তো আপনি ভেবে বসতেন— আমি আপনার প্রেমে পড়ে গেছি। পুরুষ জাতির অনেক দুর্বলতার এক দুর্বলতা হচ্ছে তারা মনে করে মেয়ে মাত্রই তার প্রেমে পড়ার জন্যে পাগল হয়ে আছে। আশা করি আপনি সেরকম নন। আপনার যেরকম স্বভাব টেলিফোন নাম্বার নিশ্চয়ই আপনার মনে নেই। কিংবা আপনি কোথাও লিখেও রাখেন নি। আমি টেলিফোন নাম্বারটা আবার লিখে দিলাম।

বিনীতা
আশা।

আমাদের মেসে একটা টেলিফোন আছে। টেলিফোন সেটের সামনে মেস ম্যানেজার আবুল কালাম বসে থাকেন। নগদ টাকা দিয়ে টেলিফোন করতে হয়। আগে রেট ছিল চার টাকা এখন বেড়ে সাত টাকা হয়েছে। মেসের টেলিফোন থেকে টেলিফোনের একটাই সমস্যা— টেলিফোনের প্রতিটি কথা আবুল কালাম সাহেব অত্যন্ত মন দিয়ে শুনেন। জগতের কোনো কাজে তিনি কোনো আনন্দ পান বলে মনে হয় না। এই কাজটা করেন খুব আনন্দ নিয়ে। টেলিফোনে কথা বলার সময় তিনি মাঝে মাঝে মাথাও খানিকটা এগিয়ে আনেন। অন্যপ্রান্ত থেকে কে কি বলছে তা শোনার চেষ্টায় এই কাজটা করা হয়। আমিই সম্ভবত একমাত্র ব্যক্তি যে কথা বলার সময় মাঝে মধ্যে রিসিভারটা আবুল কালামের কানে দিয়ে দেই যাতে সে শুনতে পারে অপরপক্ষ থেকে কী বলা হচ্ছে। এই কারণে আবুল কালাম আমাকে কিছু বাড়তি সুবিধা দেয়। যেমন আমি আগের রেট চার টাকায় টেলিফোন করতে পারি। মাঝে মধ্যে আমাকে

বাকি দেওয়া হয়।

'হ্যালো আশা?'

'জি।'

'আমি হিমু। কেমন আছ?'

'ভালো আছি। আপনি কি আজ আসবেন?'

'আজ আসতে পারব বলে মনে হচ্ছে না। বৃষ্টির জন্যে অপেক্ষা করছি। বৃষ্টি নামলেই চলে আসব।'

'বৃষ্টির জন্যে অপেক্ষা করছেন এর মানে বুঝতে পারছি না। বৃষ্টির সঙ্গে আপনার আসার সম্পর্ক কী?'

'বাংলাদেশ বৃষ্টির দেশ। এই দেশ দেখতে হলে বৃষ্টির ফোঁটার ভেতর দিয়ে দেখতে হবে। আমি ঝুম বৃষ্টির অপেক্ষা করছি। তোমার কি রেইন কোট আছে?'

'না।'

'একটা রেইন কোট কিনে ফেল। ঝুম বৃষ্টি নামলে ছাতায় কুলাবে না। এই সঙ্গে রাবারের গাম বুট।'

'এই কদিন আসেন নি কেন জানতে পারি?'

'অবশ্যই জানতে পার। সারারাত জাগতে হচ্ছে তো। রাতে জাগছি, দিনে ঘুমুচ্ছি।'

'ও।'

'কেন রাত জাগছি জানতে চাও?'

'না।'

'আমার তো ধারণা তোমার জানার খুব কৌতূহল হচ্ছে— ভদ্রতা করে বলছ— 'না'। আমার সঙ্গে ভদ্রতা করার কোনো দরকার নেই।'

'আপনার সঙ্গে ভদ্রতা করার দরকার নেই কেন?'

'কারণ আমি কারোর সঙ্গে ভদ্রতা করি না।'

'ও আচ্ছা। ঠিক আছে বলুন কেন রাত জাগছেন।'

'আমাদের মেসে এক ভদ্রলোক থাকেন তাঁর নাম জয়নাল। তিনি রাতে ঘুমুতে পারেন না। এই বেচারাকে কিছু সময় দিচ্ছি। প্রায় রাতেই তাকে নিয়ে বের হচ্ছি। ঘুরছি। ভদ্রলোক খুবই আনন্দে আছেন।'

'মানুষকে আনন্দ দেবার মহান ব্রত কি আপনি মাথায় নিয়েছেন?'

'তা না। তবে কাউকে আনন্দ দিতে ভালো লাগে। সব মানুষ ওই চেষ্টা খুব

সূক্ষ্মভাবে হলেও করে। জগতের আনন্দ যজ্ঞে সবারই নিমন্ত্রণ থাকে।'

'কঠিন বাংলা আমি বুঝতে পারি না। বুঝিয়ে দিন।'

'টেলিফোনে না, যখন দেখা হবে তখন বুঝিয়ে দেব।'

'আমাকে বৃষ্টির জন্যে অপেক্ষা করতে হবে?'

'হ্যাঁ। বেশিদিন অপেক্ষা করতে হবে না। পরশু সকাল থেকে ঝুম বৃষ্টি হবে। ইংরেজিতে যাকে বলে Cats amd Dogs রাস্তায় এক হাঁটু পানি জমে যাবে। এমন বৃষ্টি হবে যে তোমার গাম বুটের ভেতরেও রাস্তায় জমে থাকা নোংরা পানি ঢুকে যাবে।'

'পরশু সকাল থেকে বৃষ্টি হবে। কী করে বুঝলেন?'

'আমার মন বলছে।'

'যা আপনার মন বলে তাই কি হয়?'

'না তা হয় না।'

'কিন্তু আপনি যেভাবে কথা বললেন তাতে মনে হচ্ছে আপনি পুরোপুরি নিশ্চিত যে পরশু সকাল থেকে ঝুম বৃষ্টি হবে। রাস্তায় পানি জমে যাবে। আমার গাম বুটে পানি ঢুকে যাবে।'

'আমি মোটেই নিশ্চিত না। এম্নি বললাম। তবু তুমি তৈরি থেকো। সঙ্গে চায়ের সরঞ্জাম রেখো।'

'চা খেতে খেতে বৃষ্টি দেখবেন? আপনার পরিকল্পনাটা কি জানতে পারি?'

'পরিকল্পনা খুবই ইন্টারেস্টিং। পাইপের ভেতর বসে বৃষ্টি দেখব।'

'একটু পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বলুন।'

'ঢাকা শহরের বেশ কিছু লোক পাইপের ভেতর বাস করে। পাইপ সংসার। স্যুয়ারেজ লাইনের জন্যে বিরাট বিরাট পাইপ আছে। তার কিছু খোলা আকাশের নিচে পড়ে থাকে। ভাসমান মানুষরা তার ভেতর সংসার পাতে এবং অতি সুখে বাস করে। সে রকম একটা পাইপে বসে বৃষ্টি দেখব।'

'ও'

'পাইপে বাস করে এমন একটা পরিবারের সঙ্গে আমার অনেক দিনের পরিচয়। ওরা আমার জন্যে একটা পাইপ আলাদা করে রেখে দিয়েছে। সেখানে আমার বিছানা বালিশ আছে। হাতপাখা আছে। গামছা আছে। এমনকি আয়না চিরুনি তো আছে।'

'মাঝে মাঝে সেখানে গিয়ে থাকেন?'

'হ্যাঁ।'

'টয়লেটের ব্যবস্থা কী?'

'সেই ব্যবস্থাও আছে। খুবই ভয়ঙ্কর ব্যবস্থা, তবে আছে। আশা শোন আমি যে মেসে থাকি সেই মেসের ম্যানেজার আবুল কালাম তোমার সঙ্গে একটু কথা বলবেন।'

'কেন?'

'এম্নি। তোমার গলার স্বরটা টেলিফোনে কেমন শোনায় সেটা জানবেন। ম্যানেজার সাহেবের এটা একটা শখ।' মানুষের অনেক রকম শখ থাকে। কেউ ডাকটিকেট জমায়, কেউ টেলিফোনে গলার স্বর জমায়।'

'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না Why?'

আমি Why এর জবাব না দিয়ে টেলিফোন রিসিভার আবুল কালাম সাহেবের দিকে বাড়িয়ে দিলাম। তিনি গম্ভীর গলায় বলছেন— 'হ্যালো, হ্যালো, হ্যালো।' ও পাশ থেকে মনে হয় আশা টেলিফোন রেখে দিয়েছে। আবুল কালাম সাহেবের চোখে মুখে চরম হতাশা।

আমি বললাম, 'লাইন কেটে দিয়েছে?'

আবুল কালাম তিক্ত গলায় বললেন— 'কাটে নাই। রেখে দিয়েছে।'

'আচ্ছা আরেক দিন গলার স্বর শুনিয়ে দেব। গলার স্বর খারাপ না। মিষ্টিকিশোরী মেয়েদের গলা।'

কালাম সাহেব ছোট্ট নিশ্বাস ফেলে বললেন, কোনো দরকার নাই।

'আজ আপনার মনটা খারাপ কেন? চাকরি নিয়ে কোনো সমস্যা হচ্ছে?'

কালাম সাহেব এই প্রশ্নেরও জবাব দিলেন না। তার মানে হচ্ছে কিছুদিন পরপরই তাঁর চাকরি নিয়ে সমস্যা হয়। মালিক নোটিস দিয়ে বেতন বন্ধ করে দেন। কালাম সাহেব তারপরেও নিয়মিত আসেন। ম্যানেজারের চেয়ারে না বসে সামনের চেয়ারে বসেন। তারপর একদিন হঠাৎ তাঁর মুখে ক্ষীণ হাসি দেখা যায়। তিনি ফিরে যান তাঁর নিজের চেয়ারে। তাঁর পুরোনো গাম্ভীর্য ফিরে আসে। গলার স্বরও তখন অন্য রকম হয়ে যায়।

'হিমু সাহেব।'

'জি।'

'বৃষ্টি হবার কথা যেটা বললেন এটা কি ঠিক? সত্যি হবে?'

'কথার কথা বলেছি। আমি তো আর আবহাওয়া অফিসের লোক না।'

'খুব জোর দিয়ে বলেছে তো এই জন্যে বিশ্বাস করে ফেলেছিলাম। অনেকের অনেক পাওয়ার থাকে। আমার নিজেরো ছিল।'

'বলেন কী?'

'এখন নাই। ছোট বেলায় ছিল। ছয় সাত বছর বয়সের সময় ছিল। তখন যা বলতাম তাই হত।'

'আশ্চর্য তো!'

'ধরেন খেলাধুলা করছি— হঠাৎ বললাম, আজ বাড়িতে মেহমান আসবে। ঠিকই আসত। একবারের কথা স্পষ্ট মনে আছে। গোল্লাছুট খেলছি— হামিদ বলে আমার এক বন্ধু ছিল। সেও খেলছে। হঠাৎ আছাড় খেয়ে হামিদ আমার সামনে পড়ে গেল। তখন তাকে বললাম, আজ রাত তুই হেভি পিটুনি খাবি। পিটিয়ে তোর হাড্ডি ভেঙে দেবে। হামিদ বিশ্বাস করে নি। বাপ মায়ের এক ছেলে আদরে থাকতো।'

হামিদ পিটুনি 'খেয়েছিল?'

'জি খেয়েছে। সেই দিন এশার ওয়াক্তে ওদের বাড়িতে ডাকাত পড়েছিল। সবাইকে বেঁধে পিটিয়েছে। হামিদের গালে লাঠির বাড়ি মেরেছিল—চোয়ালের হাড্ডি ভেঙে মুখ বেঁকে গেল। আর ঠিক হল না। তার নাম হয়ে গেল— গাল ভাঙা হামিদ। আমাদের ক্লাসে দুটা হামিদ ছিল। একজন হল গালভাঙা হামিদ— আরেকজনের নাম অশ্লীল বলা যাবে না। গালভাঙা হামিদ প্রায়ই মেসে আসে। একদিন আপনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব।'

'জি আচ্ছা।'

উঠতে যাব কালাম সাহেব বিনয়ী গলায় বললেন— রূপা ম্যাডামের সঙ্গে কথা বলবেন না। অনেক দিন কথা বলেন না, এই জন্যে বললাম। অন্যকিছু না। টাকা সট থাকলে বাকিতে করেন। পরে দিয়ে দিলেই হবে। আমার কথায় আবার কিছু মনে করলেন না তো?

'না মনে করি নি।'

আবুল কালাম খানিকটা ঝুঁকে এসে গোপন কথা বলার ভঙ্গিতে বললেন, টেলিফোনে রূপা ম্যাডামের গলার স্বরটা যে কী মিষ্টি আসে আপনাকে বলে বুঝাতে পারব না ভাই সাহেব। অত্যধিক মিষ্টি।

'তাই নাকি?'

'জি।'

'আমি অনেক বিচার বিবেচনা করে একটা জিনিস বের করেছি ভাই সাহেব। সত্য মিথ্যা আল্লাহপাক জানেন। তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস সত্য। বলব?'

'বলুন।'

'যার গলার স্বর টেলিফোনে সুন্দর আসে তার অন্তরটাও সুন্দর।'

'এটা আপনার থিওরি?'

'জি ভাই সাহেব। পরীক্ষা করেও দেখেছি ঘটনা সত্যি। রূপা ম্যাডামকে লাইন করে দিব?'

'টেলিফোন নাম্বার মুখস্থ?'

'কেউ যখন আমার সামনে অন্য কাউকে টেলিফোন করে তখন নাম্বারটা মুখস্থ হয়ে যায়। এই যে আপনি একটু আগে টেলিফোন করলেন নাম্বার মুখস্থ হয়ে গেছে। বলব?'

'বলার দরকার নেই বিশ্বাস করছি। আপনি কি এই নাম্বারে পরে টেলিফোন করবেন? আপনার কি এই অভ্যাস আছে?'

আবুল কালাম লজ্জিত গলায় বললেন, হঠাৎ হঠাৎ করি। তবে কথা বলি না। হ্যালো বললে রেখে দেই।

ম্যানেজার টেলিফোনে রূপাকে ধরে দিল। রূপা শান্ত গলায় বলল, এত দিন পর হঠাৎ কী ব্যাপার?

'কোন ব্যাপার না। গলার স্বর শোনার জন্যে টেলিফোন করলাম।'

'গলার স্বর তো শোনা হয়েছে। এখন কি টেলিফোন রেখে দেব?'

'না আরো কিছুক্ষণ শুনি।'

'কতক্ষণ?'

'মিনিমাম তিন মিনিট।'

'তিন মিনিট কেন?'

'গান তিন মিনিটের মতো হয়। সেই জন্যেই তিন মিনিট।'

'ভালো। ঠিক আছে তিন মিনিট কথা শোন। এক নাগাড় তিন মিনিট কথা বলব? নাকি মাঝে মধ্যে তুমিও কিছু বলার?'

'রেগে আছ কেন রূপা?'

'রেগে নেই। শরীর ভালো না। নতুন কী একটা ভাইরাস এসেছে— সেই জ্বর। একটু আগে জ্বর দেখেছি— এক শ' তিন পয়েন্ট ফাইভ। মনে হয় এখন আরেকটু বেড়েছে।'

'বল কী? টেলিফোন রেখে মাথায় পানি দাও।'

'তিন মিনিট তো এখনো শেষ হয় নি। তিন মিনিট শেষ হোক।'

তিন মিনিটের শেষ এক মিনিট আবুল কালাম সাহেবের জন্যে আলাদা করে রাখ তো প্লিজ।'

'তার মানে?'

'আমাদের মেসের ম্যানেজারের শখ হল মানুষের গলার স্বর শোনা এবং সেই স্বর নিয়ে গবেষণা করা। তিনি তোমার গলার স্বরের ব্যাপারে আগ্রহী। তাকে টেলিফোন দেব?'

'দাও।'

'আমি কালাম সাহেবের দিকে টেলিফোন রিসিভার আগিয়ে দিলাম। তিনি অতি বিনয়ী গলায় বললেন, 'ম্যাডাম স্লামালিকুম...'

অন্যের টেলিফোনের কথাবার্তা আড়িপেতে শোনা কোনো কাজের কথা না। আমি উঠে পড়লাম।



আমি বসে আছি নৌকার গলুইয়ে। পা ঝুলিয়ে বসেছি। নৌকা খুব দুলছে বলেই মাঝে মাঝে নদীর পানিতে পা ডুবে যাচ্ছে। শরীর সিরসির করছে। গায়ে কাঁপন লাগছে। নদীর পানি এত ঠাণ্ডা হবার কথা না—। এই নদীর পানি এত ঠাণ্ডা কেন? মনে হচ্ছে বরফ গলা পানি। ঘটনাটা কী? স্বপ্নের নদী না তো?

ঘুমের মধ্যেও চেতনার একটি অংশ জাগ্রত থাকে। সেই অংশ আমাকে বলল— 'তুমি স্বপ্ন দেখছ। এখন তোমার ঘুম পাতলা হয়ে এসেছে। ইচ্ছা করলে তুমি জেগে উঠতে পার আবার ইচ্ছা করলে হাত পা লম্বা করে ঘুমুতেও পার। কিংবা যদি চাও স্বপ্নটা আরো কিছুক্ষণ দেখবে তাও পার। স্বপ্নকে তোমার ইচ্ছার অধীন করে দেওয়া হল।'

আমি বললাম— 'স্বপ্নটাই দেখি। স্বপ্নটা কোনো ভয়ঙ্কর দিকে মোড় না নিলেই হবে। যদি দেখি ঝড়ে নৌকা ডুবে গেছে। আমি পানিতে খাবি খাচ্ছি তা হলে সর্বনাশ। কী ঘটবে বলতো?'

'স্বপ্নে কি ঘটবে তা তো বলতে পারছি না।'

'তা হলে স্বপ্নটা বাদ থাক। আমি বরং আরো কিছুক্ষণ ঘুমাই।'

'বেশ তো। মাথা থেকে স্বপ্ন দূর করে দাও।'

আমি মাথা থেকে স্বপ্ন ঝেড়ে ফেলতে চেষ্টা করলাম। স্বপ্নটা যাচ্ছে না। স্বপ্নে নৌকাটা অনেক বেশি দুলছে। আমি পা তুলে বসলাম। নদীর পানির ঠাণ্ডাটা অসহ্য লাগছে। পা তুলে বসার সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্ন অন্যদিকে মোড় নিল। দেখা গেল বিশাল এক স্টিমার দ্রুত নদীর পানি কেটে আমাদের নৌকার দিকে আসছে। স্টিমারের মাথায় সার্চ লাইট। সেই সার্চ লাইটের আলো ফেলা হয়েছে আমার চোখে। চোখ জ্বালা করছে। নৌকার মাঝি ব্যাকুল হয়ে ডাকছে, হিমু ভাই, হিমু। স্টিমারের ইঞ্জিনের প্রচণ্ড শব্দে তাঁর গলা ঢাকা পড়ে যাচ্ছে।

স্বপ্ন অতি দ্রুত খারাপ দিকে যাচ্ছে। আমার উঠে পড়া দরকার। আমি তাই করলাম। চোখ মেললাম। নৌকার মাঝি আমাকে ডাকছে না। ডাকছেন জয়নাল সাহেব। নৌকার মাঝির মতোই ব্যাকুল গলায় হিমু ভাই, হিমু ভাই

করছেন।'

জয়নাল সাহেব বললেন, 'জানালা খোলা রেখে ঘুমিয়েছেন। অবস্থাটা দেখেছেন— বৃষ্টিতে তো গোসল করে ফেলেছেন। ওঠে গা মুছেন ঠাণ্ডা লেগে যাবে। ফ্লাস্কে করে চা এনেছি— চা খান। মুখ ধুয়ে আসবেন না বাসি মুখে চা খাবেন?

আমি কিছু বললাম না। মাথা থেকে স্বপ্নটা এখনো যায় নি। স্টিমার চোখে দেখতে না পেলেও তার ইঞ্জিনের ঘরঘর শব্দ এখনো কানে বাজছে। সার্চ লাইটের আলো এখনো আমার চোখে— এই জন্যেই চোখ মিটমিট করছি।

জয়নাল সাহেব গ্লাস ভর্তি করে চা ঢালছেন। তাঁকে খুবই আনন্দিত মনে হচ্ছে। বড় কোনো আনন্দের খবর দেবার আগে আগে মানুষের মুখে যে আভা থাকে তার চোখে মুখে সেরকম আভা। চোখে ছলছলে ভাবও আছে। আদরের কনিষ্ঠ কন্যা স্কুলের পরীক্ষায় ফাস্ট হলে বাবাদের চোখে এমন ছলছলে হয়ে যায়। জয়নাল সাহেবের কোনো মেয়ে আছে কিনা জানি না। মনে করে জিজ্ঞেস করতে হবে।

'হিমু সাহেব!'

'জি।'

'চা-টা খেয়ে আরাম পাবেন। স্পেশাল চা। গনিমিয়ার দোকানের চা। এই চা শুধু দুই জায়গায় পাওয়া যায়। এক ঠাটারি বাজার গনিমিয়ার দোকানে, আর পাওয়া যাবে বেহেশতে। আল্লাহপাক বলেছেন সব ভালো ভালো জিনিস বেহেশতে আছে।'

আমি হাত বাড়িয়ে চায়ের গ্লাস নিলাম। জয়নাল সাহেব উজ্জ্বল চোখের দিকে তাকাতেও ভালো লাগছে।

'বুঝলেন ভাই সকাল থেকে বৃষ্টি হচ্ছে তো। বৃষ্টি দেখেই মনে করলাম গনিমিয়ার দোকানের স্পেশাল চা হিমু ভাইকে খাওয়াই।'

'ঠাটারি বাজার চলে গেলেন?'

'জি। প্রথমে একটা ফ্লাস্ক কিনলাম। এত দূর থেকে তো আর কোকের খালি বোতলে করে চা আনা যাবে না। চা গরম আছে না?'

'হ্যাঁ গরম।'

'খেতে কেমন?'

'অসাধারণ। মনে হচ্ছে লিকুইড অমৃত। মিষ্টি একটু বেশি। অমৃত মিষ্টি তো

হবেই।'

'যখন এই চা খেতে ইচ্ছা করবে আমাকে বলবেন। ফ্লাস্ক কিনে ফেলেছি চা গরম করা এখন আর সমস্যা না। সামনের মাসে বেতন পেলে একটা কেরোসিনের চুলো কিনব।'

'কেন?'

'মাঝে মধ্যে ভালোমন্দ খেতে ইচ্ছা করে। চুলা থাকলে ফট করে রেঁধে ফেললাম। বৃষ্টি বাদলার দিন— ইলিশ মাছ কিনে নিয়ে আসলে— ভাজা করে... বা কলাপাতা দিয়ে মুড়িয়ে ভাতের মধ্যে দিয়ে ভাপা ইলিশ। আমি ভালো রানতে পারি। রেহানা যখন রান্না করত আমি পাশে বসে থাকতাম। দেখে দেখে শিখেছি। ইনশাল্লাহ আপনাকে রেঁধে খাওয়াব।'

'আচ্ছা।'

'রেহানার একবার টাইফয়েড হল। একুশ দিন ছিল জ্বর। আমিই রাঁধতাম।'

'ভালো তো।'

জয়নাল সাহেব খুবই আগ্রহ নিয়ে বললেন, 'ইলিশ খিচুড়ি খাবেন? ব্যবস্থা করি? বাবুর্চিকে বললেই ব্যবস্থা করে দিবে। পাঁচটা টাকা ধরায়ে দিলে হবে। রান্না আমি নিজের হাতে করব। ঝুম বৃষ্টি নেমেছে ইলিশ খিচুড়ি না খেলে বৃষ্টির অপমান হবে।'

'আজ থাক। আরেক দিন।'

জয়নাল সাহেব অনুনয়ের ভঙ্গিতে বললেন— 'আজ খুব হিসাব করে বৃষ্টি নেমেছে। শুক্রবার, অফিসে যেতে হবে না। মনে হচ্ছে আল্লাহপাক ইলিশ খিচুড়ি খাওয়ানোর জন্যেই বৃষ্টিটা নামিয়েছেন। নিয়ে আসি একটা ইলিশ কিনে? কী বলেন?'

'আচ্ছা আনুন। রান্না শেষ হলে সব খাবার টিফিন কেরিয়ারে ভরবেন। টিফিন কেরিয়ার হাতে নিয়ে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে উপস্থিত হবেন।'

'কোথায় উপস্থিত হব?'

'ঠিকানা দিয়ে যাচ্ছি— ওই ঠিকানায়।'

'বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে যাব?'

'অবশ্যই। বৃষ্টি উপলক্ষে খিচুড়ি খাচ্ছেন। বৃষ্টিতে ভিজবেন না?'

'খুবই ইম্পর্টেন্ট কথা বলেছেন ভাই সাহেব। বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে খিচুড়ি না খেলে— কিসের ইলিশ খিচুড়ি? আপনি ঠিকানা বলে দেন— আমি

নিয়ে যাব।'

জয়নাল সাহেবকে ঠিকানা দিয়ে আমি নিচে নামলাম। বেশি দেরি করা যাবে না বৃষ্টি থাকতে থাকতেই আশাদের বাড়িতে উপস্থিত হব। একটা ছোট্ট চমক। আশাকে বলেছিলাম দুদিন পর বৃষ্টি নামবে। পাকে চক্রে তাই হচ্ছে দুদিন পরই বৃষ্টি হচ্ছে। ঝড়ে বক মরে ফকিরের কেরামতি জাহির হয়। যথা নিয়মে বৃষ্টি হচ্ছে— আমার কেরামতি জাহির হচ্ছে।

বের হবার মুখে মেস ম্যানেজার আবুল কালামের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তার চাকরি আবার হয়তো নট হয়েছে। তিনি ম্যানেজারের চেয়ারে বসে নেই। অন্য চেয়ারে বসা। মুখ অত্যন্ত মলিন। রাতে মনে হয় ঘুমও হয় নি। চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে। একদিনে বয়স বেড়ে গেছে। এক শালিক দেখা যেমন খারাপ— মলিন মুখে একাকী কেউ বসে আছে দেখা ঠিক সেরকমই খারাপ। ঢিল মেরে অমঙ্গলের এক শালিক উড়িয়ে দেওয়া যায়। এক মানুষ উড়ানো যায় না। তবে মানুষটার মন ভালো করার চেষ্টা করা যায়। আমি সেই দিকেই অগ্রসর হলাম। হাসি মুখে বললাম, আবুল কালাম সাহেবের খবর কী?

'ভালো।'

'মন খারাপ না-কি?'

'না।'

'বৃষ্টি কেমন নেমেছে দেখেছেন? কুকুর বেড়াল বৃষ্টিকেও ছাড়িয়ে গেছে। এই বৃষ্টির নাম সিংহ বাঘ বৃষ্টি। বৃষ্টিতে ভিজবেন নাকি। বৃষ্টি স্নান করতে চাইলে চলে আসুন।'

'না।'

'চাকরি নিয়ে কোনো সমস্যা হয়নি তো? নিজের চেয়ার ছেড়ে অন্য চেয়ারে বসে আছেন এই জন্যে জিজ্ঞেস করলাম। কোনো সমস্যা হয়েছে?'

'না।'

আবুল কালাম 'না' বললেন খুবই দুর্বল ভঙ্গিতে এবং অন্যদিকে তাকিয়ে-এর অর্থ একটাই, চাকরি আবার নট হয়েছে। চাকরি ফিরে না পাওয়া পর্যন্ত ভদ্রলোকের মুখের বিমর্ষভাব কাটবে না। তবু শেষ চেষ্টা হিসেবে বললাম— বর্ষার প্রথম বৃষ্টিতে কই মাছের মনেও আনন্দ হয়। তারা পুকুর ছেড়ে লাফাতে লাফাতে ডাঙায় উঠে আসে। আর আপনি মুখ ভোতা করে বসে আছেন?

আবুল কালাম বিরক্ত মুখে বললেন— আমি তো কই মাছ না। খামখা

লাফালাফি করব কেন? আপনি বৃষ্টিতে ভিজে লাফালাফি করেতে চান করেন। কেউ তো আপনাকে না বলছে না।

'চাকরি চলে গেছে?'

'হ্যাঁ চলে গেছে। খুশি হয়েছেন? যান এখন খুশি মনে বৃষ্টিতে ভিজেন।'

এক ঘণ্টা ঝুম বৃষ্টি ঢাকা শহর অচল করে দেবার জন্যে যথেষ্ট। রাত তিনটা থেকে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। এখন বাজছে নটা। ছয় ঘণ্টা এক নাগাড়ে বৃষ্টিতে শহর পানিতে ডুবে যাবার কথা। ডুবন্ত শহর দেখারও আনন্দ আছে। চৈত্রদিনের শুকনো শহর আর বর্ষা দিনের ডুবন্ত শহরের মধ্যে আকাশ পাতালের চেয়েও বেশি ফারাক। এক শহরের দুই রূপ না, যেন সম্পূর্ণ আলাদা দুটা শহর।

প্রতিটি বড় রাস্তা নদী হয়ে গেছে। রাস্তায় নদীর স্রোতের মতো স্রোত আছে। ঘূর্ণি পর্যন্ত আছে। অবস্থা যা জোয়ারভাটা থাকাও বিচিত্র না। ফুটপাতেও এক হাঁটু পানি। ম্যানহোলের খোলা ঢাকনা যখন চোখে দেখা যায় তখনো মানুষ ম্যানহোলে পড়ে যায়— আর আজ তো পানিতেই সব ঢাকা। আজ এগুতে হবে হাঁটি হাঁটি পা পা করে। প্রথম পা ম্যানহোলে পড়ল কিনা এ বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে তবেই দ্বিতীয় পা তুলতে হবে।

রাস্তার জায়গায় জায়গায় গাড়ি ডুবে আছে। গাড়ির মালিকরা অসহায় ভঙ্গিতে টোকাই জোগাড় করার চেষ্টা করছে। গাড়ি ঠেলতে হবে। টোকাইরা গাড়ির চাকার হাওয়া ছেড়ে দেওয়াতে যেমন দক্ষ— গাড়ি ঠেলার ব্যাপারেও সেরকমই দক্ষ। একটা সাধারণ পনের শ' সিসি গাড়ি ঠেলার জন্যে চার জন টোকাই-ই যথেষ্ট। মহানন্দে তারা গাড়ি ঠেলে নিয়ে যাবে। বখশিশ পেলে ভালো। না পেলেও কোনো ক্ষতি নেই। গাড়ি ঠেলতে পারার আনন্দেই তারা আনন্দিত।

হরতালের দিন এইসব রাস্তায় ক্রিকেট খেলা হয়। আজ হচ্ছে সাঁতার সাঁতার খেলা। এরশাদ সাহেবের পথকলিরা পানিতে লাফালাফি ঝাঁপাঝাপি করছে। এরমধ্যে একটা কলাগাছও দেখি যোগাড় হয়েছে। কলাগাছ ধরে সাঁতার দেবার চেষ্টা হচ্ছে। একটা ফুটফুটে বাচ্চা মেয়ে ঘোড়ায় চড়ার ভঙ্গিতে অতি গম্ভীর মুখে কলাগাছে বসা। তিন-চারটা তার বয়সী ছেলে কলাগাছ ঠেলে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। যেন মেয়েটি বর্ষারানী। বৃষ্টি উৎসবের রানী। অতি মজাদার দৃশ্য। সিএনএন টিভির লোকজন থাকলে এই দৃশ্য ক্যামেরায় নিয়ে নিত। "তলাবিহীন ঝুড়ির

দেশের জলকেলি” শিরোনামে মজার কোনো রিপোর্ট পৃথিবীর মানুষরা দেখতে পেত।

বিকল্প ব্যবস্থায় বাংলাদেশের মানুষজন পারদর্শী। কাপড় না ভিজিয়ে রাস্তা পারাপারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। দুটা টুলবক্সের সাহায্যে কাজটা করা হচ্ছে। দুটাকা করে পারানি। আরো তিন-চারদিন এই অবস্থা চললে অতি অবশ্যই রাস্তায় নৌকা নেমে যাবে। আওয়ামী নেতারা মুজিবকোট গায়ে দিয়ে হাসিমুখে বলবেন— ‘বলেছিলাম না নৌকা ছাড়া আমাদের গতি নাই। দেখলেন তো?’

কলিং বেল টিপতেই দরজা খুলে দিল আশা। এক সেকেন্ড দেরি হল না। মনে হল দরজায় হাতল ধরে সে দাঁড়িয়ে ছিল। কেউ বেল টিপবে আর সে দরজা খুলবে।

আমি বললাম— ‘চল বের হয়ে পড়ি বৃষ্টি নেমেছে।’

আশা বলল, আপনার একী অবস্থা। ভিজে কী হয়েছেন? হাতের চামড়া নীল হয়ে গেছে। আপনার ছাতা নেই?

‘না।’

‘এমন বৃষ্টিতে ছাতা ছাড়া বের হয়েছেন? আপনার তো অসুখ করবে।’

‘তুমি সময় নষ্ট করছ কেন। বৃষ্টি থাকতে থাকতে বের হতে হবে।’

‘ঘরে ঢুকবেন না?’

‘গা দিয়ে পানি পড়ছে। এই অবস্থায় কার্পেটওয়ালা ঘরে ঢোকা যাবে না।’

‘টাওয়েল দিচ্ছি গা মুছে নিন।’

‘আবার তো ভিজতেই হবে গা মুছে লাভ কী?’

‘এ রকম বৃষ্টি আমি আমার জীবনে দেখি নি। কী অদ্ভুত কাণ্ড! নন স্টপ বৃষ্টি।’

‘পাঁচ মিনিট সময় দিলাম এর মধ্যে বের হয়ে এসো।’

‘গরম কফি বানিয়ে দেব। আপনি শীতে কাঁপছেন।’

‘কিচ্ছু লাগবে না। তুমি বের হও। গামবুট, রেইন কোট ছাতা সব আছে তো?’

‘সবই আছে। তবে আমি কোনোটাই নেব না। আপনি যেভাবে বের হয়েছেন আমি ঠিক সেভাবেই বের হব। আপনার মতো খালি পায়ে হাঁটব।’

‘সেকী?’

‘শুধু শাড়ি পাল্টে প্যান্ট শার্ট পরব। ভেজা শাড়ি গায়ে লেপ্টে থাকলে দেখতে

খুব খারাপ লাগবে। আপনার পরিকল্পনা কী? আজ আমরা কী দেখব? পাইপে বসে বৃষ্টি?'

'পাইপে বসে বৃষ্টি বিলাস করা হবে। ইলিশ খিচুড়ি খাওয়া হবে। তবে তার আগে সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানে যেতে হবে। সেখানে কদম ফুলের গাছ আছে। গাছ থেকে কদম ফুল ছিঁড়তে হবে।'

'কেন?'

'কদম ফুল ছাড়া বর্ষা যাপন হয় না।'

'তার মানে।'

'বর্ষা দেখতে হলে কদম ফুল লাগে। একেকটা দেখার একেক রকম নিয়ম। জোছনা দেখতে হয় সাদা রঙের কাপড় পরে। কালো কাপড় পরে জোছনা দেখা যায় না। একইভাবে বর্ষা দেখতে কদম ফুল লাগে।'

'কে বানিয়েছে এসব নিয়ম।'

আমি হাসলাম। জবাব দিলাম না। আশা গেল কাপড় বদলাতে। আকাশ পরিষ্কার হয়ে আসছিল, আবারো মেঘ জমতে শুরু করেছে। মনে হচ্ছে আজ সারাদিনে বৃষ্টি ধরবে না। মেঘের পরে মেঘ জমবে। আঁধার হয়ে আসবে। রূপা তার সারাউন্ড সিস্টেমের ট্রাম্পেটের কোনো সিডি চালিয়ে দেবে। বৃষ্টি নামলেই তার নাকি ট্রাম্পেট শুনতে ইচ্ছা করে।

রাস্তায় নেমে আশা বাচ্চা মেয়ের মতো চেঁচিয়ে বলল 'What a day!'

আমি বললাম, 'খুব মজা লাগছে।'

আশা বলল, 'মজা না, অন্য রকম লাগছে। গায়ে যেমন বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছে, মনে হচ্ছে শরীরের ভেতরও পড়ছে। শুধু যদি গায়ে বৃষ্টির ফোঁটা পড়ত তা হলে হত মজা বা ফান। যেহেতু বৃষ্টির ফোঁটা শরীরের ভেতরও পড়ছে কাজেই এটা আর ফান না— অন্য কিছু। আচ্ছা শুনুন— আপনি তো নানানভাবে আমাকে চমকে দিয়েছেন। আমিও কিন্তু আপনাকে চমকে দিতে পারি। আপনি যদি এই মুহূর্তে আমার হাত ধরেন তা হলে কিন্তু ভয়ঙ্কর চমকাবেন।'

'কেন বলত?'

'আগে বললে তো আর চমকাবেন না। কাজেই হাতটা ধরুন দেখি চমকান কিনা। ভালবেসে হাত ধরতে বলছি না। চমকাবার জন্যে হাত ধরা।'

আমি আশার হত ধরলাম এবং চমকে উঠলাম। চমকাবার কারণ আছে মেয়েটার গা জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে।

আশা হাসি মুখে বলল, জ্বর কত আন্দাজ করুন তো।

'এক শ' চার?'

'হয় নি এক শ' তিন। আপনার শরীর ঠাণ্ডা হয়ে আছে তো এই জন্যে জ্বর বেশি লাগছে।'

আশা হাসছে। ছোট বাচ্চারা বড়দের সঙ্গে মজার কোনো তামাশা করলে যেমন আনন্দ পায় সেই আনন্দের ঝিলিক তার চোখে মুখে।

'হিমু সাহেব জ্বর গায়ে নিয়ে আপনি কখন বৃষ্টিতে ভিজেছেন?'

'হ্যাঁ ভিজেছি। ইচ্ছাকৃত ভেজা না। অনিচ্ছাকৃত। তখন আমার বয়স পাঁচ কিংবা ছয় হবে। প্রচণ্ড জ্বর এসেছে। শীতে শরীর কাঁপছে। গায়ের উপর একটা কম্বল দেওয়া হয়েছে। সেই কম্বলে শীত মানছে না। বাবাকে বললাম— গায়ের উপর আরেকটা কিছু দিতে। তিনি লেপ নিয়ে এলেন। লেপ যখন গায়ে দিতে গেলেন তখন হঠাৎ করে বৃষ্টি শুরু হল। বাবা আমাকে বিছানা থেকে টেনে তুললেন। খালি গা করে দাঁড়া করিয়ে দিলেন উঠোনে।

'উনি খুবই ভালো কাজ করেছেন। জ্বর বেশি হলে গায়ে পানি ঢালতে হয়। এতে জ্বর দ্রুত নামে।'

আমার বাবা জ্বর নামাবার জন্যে কাজটা করেন নি। তিনি কাজটা করেছেন যাতে শরীরের ব্যথা বেদনা নামক তুচ্ছ ব্যাপার আমি জয় করতে পারি। এটা ছিল তাঁর নিজস্ব শিক্ষা পদ্ধতির একটা অংশ। ঐ রাতে খুব বৃষ্টি হয়েছিল। ভোর হবার কিছুক্ষণ আগে বৃষ্টি থামে। বৃষ্টি না থামা পর্যন্ত আমাকে বাবা উঠানে ধরে রেখেছিলেন। নিজেও বৃষ্টিতে ভিজেছেন আমাকেও ভিজিয়েছেন।

'আপনার জ্বর সেরেছিল?'

'আমার জ্বর সেরে গিয়েছিল—কিন্তু বাবার হয়ে গেল নিউমোনিয়া। জমে মানুষে টানাটানির অবস্থা। তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হল। হাসপাতালের বিছানায় বাবার পাশে আমি শুয়ে থাকি। বাবা বিড়বিড় করে প্রলাপ বকেন। আশা তুমি কি অসুস্থ মানুষের প্রলাপ কখনো শুনেছ?'

'না।'

'খুব ইন্টারেস্টিং। মনে হয় খুব ঘনিষ্ট কারো সঙ্গে কথা বলছে। কথা বলার ভঙ্গিটাও ফরম্যাল। যেমন আমার বাবা প্রলাপের সময় বলেছিলেন—'

'কী বলেছিলেন?'

'অন্য আরেকদিন বলব?'

'আজ না কেন?'

'কৌতূহলটা থাকুক।'

'আচ্ছা বেশ থাকুক। হিমু সাহেব...'

'বল।'

'আপনাকে খুবই গোপন একটা কথা বলতে চাচ্ছি। যে কথাটা আর কাউকে কখনো বলি নি। জ্বরের কারণে আমার মধ্যে এক ধরনের ঘোর তৈরি হয়েছে। তারপর পড়ছে বৃষ্টি। ইনাইবিশন কেটে গেছে। মনে হচ্ছে কথাটা বলা যায়। বলব?'

'বল।'

আশা হাসতে হাসতে বলল, 'আজ না। অন্য আরেকদিন বলব। কৌতূহলটা থাকুক। আমার নাচতে ইচ্ছা করছে। What a day!

কদম গাছ ভরতি ফুল।

নগরীর মানুষ গোলাপের ভক্ত। গোলাপ ভালো দামে বিক্রি হয়। কদমের বাজার দর নেই। মাঝেমধ্যে পাওয়া যায় এক টাকা পিস। যে ফুল খোপায় পরা যায় না, হাতে নিয়ে বসে থাকতে হয় কে কিনবে সেই ফুল?

আশা অবাক হয়ে বলল, 'এটা ফুল না ফল? আমি বললাম, ফলের মতো দেখতে হলেও আসলে ফুল।'

'আচ্ছা এমন কোনো ফল কি আছে দেখতে ফুলের মতো?'

'থাকতে পারে প্রকৃতি তার জীবজগৎ নিয়ে নানান ধরনের এক্সপেরিমেন্ট করেছে— ফুলের মতো ফল বাগানের এক্সপেরিমেন্টও নিশ্চয়ই করেছে।'

ফুল পাড়তে সমস্যা হল না। আশা দু হাত ভরতি করে ফেলল। আমি লক্ষ্য করলাম আশার আনন্দময় মুখ হঠাৎ যেন কেমন হয়ে গেল। যেন আচমকা ভয়ঙ্কর কোনো কথা মনে পড়ে গেছে।

আশা শুকনো গলায় বলল— আমার চিন্তা লাগছে।

'কী চিন্তা?'

'আমার মনে হচ্ছে "ফুলের মতো ফল। ফলের মতো ফুল" এই লাইনগুলি মাথায় ঢুকে— যাবে। ছোটবেলা থেকে আমার এই সমস্যা আছে। হঠাৎ কোনো একটা লাইন মাথায় ঢুকে যায়। তখন রেকর্ড বাজার মতো এই লাইনগুলি মাথায় বাজতে থাকে। জাগ্রত অবস্থায় বাজে, ঘুমের মধ্যে বাজে। অন্তহীন 'লুপ' চলছেই, চলছেই। জীবন অতিষ্ঠ হয়ে যায়।'

'লাইনগুলি কি মাথায় ঢুকে গেছে?'

'হুঁ।'

'বের করার কোনো পদ্ধতি নেই?'

'না।'

'ফালতু এই লাইনগুলি বের করে নতুন কোনো লাইন ঢুকিয়ে দাও।'

'নতুন লাইনগুলি কী?'

'বাদলা দিনের কবিতার লাইন ঢুকিয়ে দাও— বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদে এল বান। আরেকবার বলি— বাদলা দিনে মনে পড়ে ছেলেবেলার গান। বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদে এল বান। আরেকবার বলব?'

'না।'

'এটা যদি পছন্দ না হয়, মজাদার কোনো কবিতার লাইন বলি?'

শিওরে বসিয়া যেন তিনটি বাঁদরে
উকুন বাছিতেছিল পরম আদরে।

আশা ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বলল, আপনি পুরো ব্যাপারটাকে ফান হিসেবে নিচ্ছেন। আমার জন্য এটা যে কী পরিমাণ কষ্টদায়ক আপনি জানেন না। আমার এই সমস্যার জন্যে আমি নিউরোলজিষ্ট দেখিয়েছি, সাইকিয়াট্রিস্ট দেখিয়েছি।

'বল কী?'

'দু'টা লাইন মাথার ভিতর ঘুরপাক খাবে। লক্ষবার কোটিবার চলতেই থাকবে। প্রথমে খুব ধীরে চলবে তারপর গতি বাড়তে থাকবে। মনে করুন আমি বই পড়ছি, কিংবা কোনো কাজ করছি। কিন্তু মাথার ভেতর ঘুরছে— ফলের মতো ফুল। ফুলের মতো ফল। ব্যাপারটা কি আপনার কাছে ভয়াবহ মনে হচ্ছে না?'

'এতক্ষণ হচ্ছিল না, এখন হচ্ছে।'

'আমার ধারণা আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি। শুধু আমার একার ধারণা না। ডাক্তারদেরও সেরকম ধারণা। ডাক্তাররা অবিশ্যি সরাসরি বলছেন না। তারা বলছেন ব্রেইনের নিউরো কারেন্টে সাময়িক সর্ট সার্কিট হচ্ছে। এটা হচ্ছে ইলেকট্রোলাইট ইমব্যালান্সের জন্যে। সরি! বৃষ্টি দেখতে এসে আমি ডাক্তারি কচকচানি শুরু করেছি।'

'মাথায় কি ফুল-ফল এখনো ঘুরছে?'

'হুঁ।'

'কতক্ষণ থাকে?'

'কোনো ঠিক নেই। তিন-চার ঘন্টা থাকে— আবার বেশ অনেক দিন থাকে এ রকম হয়েছে। আমার সবচে বেশি ছিল— ২৭ দিন। আমাকে হাসপাতালে ভরতি করতে হয়েছিল।'

'বল কী? সবচে বেশি দিন যে লাইনটা ছিল সেটা মনে আছে?'

'আছে।'

'বলতে অসুবিধা আছে? নাকি বললে সেটা আবার ঘোরা শুরু করবে।'

'না ঘোরা শুরু করবে না। ২৭ দিন যে লাইনটা আমার মাথায় ছিল সেটা হল—What a day বাসে করে মেরিল্যান্ড যাচ্ছিলাম। মাঝপথে গাড়ির চাকার হাওয়া চলে গেল। হাইওয়ের এক পাশে গাড়ি রেখে ড্রাইভার গাড়ির চাকা বদলাচ্ছে। যাত্রিরা সবাই বাস থেকে নেমেছে। আমিও নামলাম। দেখি খুবই অপূর্ব দৃশ্য। শীতের শুরুতে পাতা ঝরার আগে পাতাগুলি লাল হয়ে যায়। তাই হয়েছে পুরো বন লালচে হয়ে গেছে। ঝলমলে রোদ, নীল আকাশ। আমি মুগ্ধ হয়ে বললাম— What a day! এই বলাই আমার কাল হল। সাতাশ দিন What a day মাথায় নিয়ে বসে রইলাম।'

'এই বাক্যটা তো মনে হয় তুমি প্রায়ই বল। আজো দুবার বলেছ?'

'হুঁ।'

'তোমার কি শরীর খারাপ লাগছে?'

'হ্যাঁ। মাথায় যন্ত্রণা শুরু হয়েছে।'

'ফুল-ফল মাথায় ফুল স্পিডে ঘুরছে?'

'হুঁ।'

'এক কাজ কর। কদম ফুলগুলি ফেলে দাও। চোখের সামনে ফুল-ফুল কিচ্ছু থাকবে না।'

'না ফুল ফেলব না। আমি বাসায় চলে যাব। আমি হাঁটতে পারব না— রিকশা বা বেবিটেক্সি নিন।'

মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। সেইসঙ্গে ঝড়ো হাওয়া। আশা একটু পরপর মাথা ঝাঁকাচ্ছে। তার চোখ লাল। মনে হয় তার খুব কষ্ট হচ্ছে।

আমি বললাম, মাথার যন্ত্রণাটা কি খুব বেশি?'

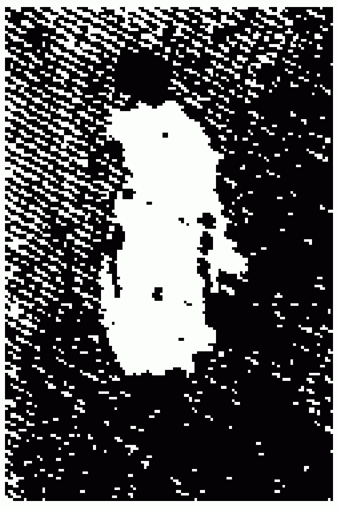
আশা হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়ল। ক্ষীণ গলায় বলল, 'বাসায় যাব। জ্বরটা মনে

হয় চেপে আসছে। আমি দুঃখিত সারাদিনের প্রোগ্রাম নষ্ট হল। একটা রিকশার ব্যবস্থা করুন না।'

'মাঠের মাঝখানে তো রিকশা আসবে না। তোমাকে হেঁটে রাস্তা পর্যন্ত যেতে হবে। পারবে না?'

আশা চাপা গলায় বলল, 'না।'

এখন মেয়েটা কাঁদতে শুরু করেছে। চোখের পানির রহস্যময় ব্যাপার হচ্ছে— ঝমঝম বৃষ্টির পানির মধ্যেও চোখের পানি আলাদা করা যায়।



কেউ একজন মাথা মালিশ করে দিচ্ছে। নরম হাত চুলের উপর দিয়ে বুলিয়ে নিচ্ছে। মাঝে মাঝে চুলের ভেতর দিয়ে চিরুণি চলার মত হচ্ছে। বেছে বেছে এমন সব চুলের গুচ্ছ ধরে টান দিচ্ছে যাদের টান দেওয়াই উচিত। অতি আরামদায়ক অবস্থা। মাথা মালিশের এই অপূর্ব কারিগর যে জয়নাল সাহেব তা বুঝতে পারছি। নেকমর্দ সাহেবের সুযোগ্য শিষ্য তাঁর সমস্ত প্রতিভা ঢেলে দিয়েছেন। আমি মোগল সম্রাট হলে বলতাম— 'দাড়িপাল্লায় জয়নাল সাহেবকে তোল। তাঁর ওজনের সমান ওজন আশরাফি তাকে দাও এই সঙ্গে দুটা হাতি, একটা তরবারি এবং মণিমুক্ত বসানো পাগড়ি দিয়ে দাও। এখানেই শেষ না আরো বাকি আছে। একটা পরগনার জায়গীরদারিও তাঁর। গরগনার নাম 'শিরশান্তি'।

'হিমু ভাই!'

'হুঁ।'

'আরাম পাচ্ছেন?'

'পাচ্ছি। চোখ মালিশ করবেন না?'

'চোখ মালিশ করলে ঘুমিয়ে পড়বেন এই জন্যে চোখ মালিশ করছি না। আমি আসলে আপনার মাথা মালিশ করছি ঘুম ভাঙানোর জন্যে।'

'সে কী!'

'আপনি গভীর ঘুমে ছিলেন। ঘুমন্ত মানুষের ঘুম চট করে ভাঙানো ঠিক না। এই জন্যে মাথায় হাত বুলিয়ে বুলিয়ে ঘুম ভাঙাচ্ছি।'

'আমার ঘুম ভাঙানোটা কি প্রয়োজন?'

'জিনা প্রয়োজন নাই। একটা ঘটনা ঘটেছে। ভাবলাম আপনাকে বলি। মনটা খারাপ।'

'পরিচিত কেউ মারা গেছে?'

'জিনা।'

'তা হলে আর কি? চোখ মালিশ শুরু করে দিন। আমি ঘুমিয়ে পড়ি।'

'জি আচ্ছা।'

চোখ মালিশ শুরু হতে হতে থেমে গেল। ঘটনাটা মনে হচ্ছে আমাকে শুনতেই হবে। অথচ চোখ মেলতে পারছি না।

'হিমু ভাই!'

'বলুন।'

'মনটা খারাপ। চোখের সামনে ঘটনাটা ঘটেছে তো— এই জন্যে মনটা অত্যধিক খারাপ। চোখের সামনে না ঘটলে খারাপ লাগতো না। চোখের আড়ালে কত কিছুই ঘটে। ঠিক না?'

'অবশ্যই ঠিক। কথা বলার সময় মাথা মালিশ বন্ধ করে দিচ্ছেন কেন? নাপিত যেমন চুল কাটতে কাটতে কথা বলে— আপনিও তাই করুন— কথা এবং কাজ এক সঙ্গে চলুক।'

'ঘটনাটা বলব?'

'বলুন।'

'মনটা এত খারাপ হয়েছে ভাই সাহেব। তখনই বুঝেছি আজ সারারাত আমার ঘুম হবে না।'

'ঘুম তো আপনার এম্নিতেই হয় না।'

'তাও ঠিক। কথার কথা বলেছি ভাই সাহেব। ঘটনাটা হল— আমাদের মেসের ম্যানেজার আবুল কালামকে পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে।'

'ও।'

'রাত এগারোটার সময় পুলিশ এসেছে। আমার সঙ্গে প্রথম দেখা। পুলিশ আমার সঙ্গে খুবই ভদ্রব্যবহার করেছে। জিজ্ঞেস করল, কালাম বলে কেউ আছে? আবুল কালাম? ভাবলাম বলি— 'না'। না বলতে গিয়েছি মুখ দিয়ে সত্যি কথা বের হয়ে এল। পুলিশের সাথে মিথ্যা কথা বলা যেমন কঠিন। সত্যি কথা বলাও কঠিন। বললাম— জি আবুল কালাম সাহেব অফিস ঘরে বসে আছে। তারপর নিজেই অফিস ঘর দেখিয়ে দিলাম।'

'ভাল করেছেন।'

'আমার চোখের সামনে হ্যান্ডকাফ লাগিয়ে দিল।'

'মারধোর করেছে?'

'মারধোর করে নাই। খুবই ভদ্রভাবে বলেছে— চলুন থানায় চলুন।'

'এটা দেখেই মন খারাপ হয়েছে?'

'পুলিশ অ্যারেস্ট করেছে। হ্যান্ডকাফ পরিয়ে থানায় নিয়ে যাচ্ছে আবার ভদ্র

ব্যবহার করছে। এটা খুবই খারাপ লক্ষণ। আমি ভুক্ত ভোগী— আমি জানি।'

'আপনাকেও পুলিশ অ্যারেস্ট করেছিল?'

'জি। অনেক দিন আগের কথা। ঘটনাটা বলব?' '

'বলতে চাইলে অবশ্যই বলবেন। তার আগে বলুন— আবুল কালামকে এ্যারেস্ট করেছে কেন?'

'কেউ কিছু জানে না ভাই সাহেব। কারোর জানার গরজও নাই। না থাকারই কথা। আমি একবার ভাবলাম থানাতে গিয়া খোঁজ নিয়ে আসি। সাহসে কুলায় নাই। বাংলা একটা প্রবচন আছে না ঘরপুড়া গরু মেঘ দেখলে ভয় পায়।'

'মেঘ না সিঁদুরে মেঘ।'

'জি। আমার ঘটনাও সেরকম। থানা পুলিশ ভয় পাই। খাকি রং দেখলেই ভয় পাই। আমার একটা খাকি রঙের প্যান্ট আছে, কোনোদিন পরি নাই।'

'পুলিশের ডলা খেয়েছিলেন?'

'জি। ঘটনা বলব।'

'আজ থাক। আরেক দিন শুনব। এক দিনে দুইবার পুলিশের ডলার গল্প ভালো লাগবে না। বদহজম হয়ে যাবে।'

'সংক্ষেপে বলি? ঘটনাটা আজই বলতে ইচ্ছা করছে। সবদিন সবকিছু বলার ইচ্ছা করে না। সত্যি কথা বলতে কি আপনাকে যে ঘুম থেকে তুলেছি— ঘটনাটা বলার জন্যে।'

'তা হলে বলুন। সার সংক্ষেপ। ইংরেজিতে যাকে বলে সামারী এন্ড সাবসটেন্স।'

'চা দেই ভাই সাহেব। চা খেতে খেতে গল্পটা শুনেন?'

'গনিমিয়ার দোকানের চা?'

'জি। রাত বারোটার সময় নিয়ে আসছি। গনিমিয়ার দোকান সারারাত খোলা থাকে। একবার আপনাকে নিয়ে তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিব। বিশিষ্ট ভদ্রলোক। চা বিক্রি করে উত্তরখানে তিনতলা বাড়ি বানিয়েছে। বাড়ির নাম গনি কুঠির। দেখলে চোখ জুড়ায়ে যায়। দিব এক কাপ চা?'

আমি বিছানায় উঠে বসে হতাশ গলায় বললাম, 'দিন।'

জয়নাল সাহেব আঁট ঘাট বেঁধে নেমেছেন। পুলিশের ডলা খাওয়ার গল্প আজ আমাকে শুনতেই হবে।

জয়নাল সাহেব ক্ষীণ স্বরে বললেন— 'ভাই সাহেব আমাকে দেখে আপনার

কী মনে হয়? আমি লোকটা বোকা না বুদ্ধিমান?'

'আপনি বোকাও না বুদ্ধিমানও না। আপনি সমান সমান।'

'আপনি আমাকে স্নেহ করেন বলে এটা বললেন। আসলে আমি খুবই বোকা টাইপ মানুষ।'

'বোকা টাইপ মানুষ নিজেকে বুদ্ধিমান মনে করে। আপনি তো তা করছেন না। কাজেই আপনি বোকা না।'

'আমি একসময় নিজেকে বুদ্ধিমান ভাবতাম। খুবই বুদ্ধিমান ভাবতাম। পুলিশ অ্যারেস্ট করার আগ পর্যন্ত ভাবতাম আমার মতো বুদ্ধিমান লোক কমই আছে।'

'আপনার ঘটনাটা বলার জন্যে আপনি বুদ্ধিমান না বোকা এটা জানা কি খুব দরকার?'

'জি দরকার আছে। আমি বোকা এটা ভেবে গল্পটা শুনলে আপনার কাছে এক রকম লাগবে। আবার আমি বুদ্ধিমান এটা জেনে গল্পটা শুনলে আপনার কাছে আরেক রকম লাগবে।'

'ধরে নিলাম আপনি বোকা, গল্প শুরু করুন। বাতি জ্বালাবেন? না ঘর অন্ধকার থাকবে?'

'অন্ধকার থাকুক। গল্পটা বলার সময় চোখে পানি এসে যেতে পারে। পুরুষ মানুষের চোখের পানি যে দেখে তার জন্যে অমঙ্গল।'

'কে বলেছে আপনাকে?'

'এটা প্রচলিত কথা—

দেখলে ভাল নারীর চোখের জল।
পুরুষের চোখের জলে আছে অমঙ্গল।
কহেন কবি কালিদাস
ব্যাভিচারীর চোখের জলে আছে সর্বনাশ।

গল্প শুরু করব ভাই সাহেব?'

'করুন।'

জয়নাল সাহেব সিগারেট ধরালেন। গল্পের ফাঁকে ফাঁকে সিগারেট টানছেন। সিগারেটের আলোর আভায় তাঁর চোখ মুখখানি দেখা যাচ্ছে। আমি লক্ষ্য রাখছি তার চোখের দিকে। চোখে পানি দেখা যায় কিনা। কোথায় যেন পড়েছিলাম

অনিদ্রা রোগীর চোখে জল থাকে না। জয়নাল সাহেব কথা বলছেন ফিসফিস করে। অন্ধকারে মানুষ স্বাভাবিকের চেয়েও উঁচু গলায় কথা বলে। জয়নাল সাহেব তা করছেন না। আমি বিবাহ করেছিলাম অল্প বয়সে। এখনকার পুরুষ মানুষ ৩৫ বছর চল্লিশ বছরের আগে বিবাহ করে না। আমি বিবাহ করেছিলাম ২৩ বছর বয়সে। আমার স্ত্রীর নাম রেহানা। বিবাহের আগে শুনেছিলাম রেহানার চেহারা ছবি মোটামুটি— গাত্রবর্ণ কালো। একটু মোটা ধাঁচ। মনটা খুবই খারাপ হয়েছিল। আমাদের ছিল অ্যারেনজড ম্যারেজ।

আমার মামা বললেন, 'ভাইগ্না পাত্রী দেখবা? বিবাহের আগে কন্যাকে চোখের-দেখা দেখা হাদিসে জায়েজ আছে। তবে কথা বলতে পারবে না। কন্যার কণ্ঠস্বর পরপুরুষের শোনা হারাম।'

আমার মনটা অত্যাধিক খারাপ— কারণ কন্যার চেহারা ছবি ভালো না। দেখলে মন খারাপ হবে এই ভেবে বললাম, 'দেখব না।'

কুড়ি হাজার এক টাকা কাবিনে বিবাহ হয়ে গেল। রেহানাকে দেখলাম বাসর রাতে। ভাই সাহেব মেয়ে দেখে আমার পালপিটিশন শুরু হয়ে গেল। শরীর ঘেমে গেল। শুধু হাঁচি আসতে লাগল। প্রায় বিশটার মত হাঁচি দিলাম।

'মেয়ে অতি রূপবতী?'

'জি ভাই সাহেব। যেমন চেহারা, তেমন গায়ের রং। তেমনই লম্বা চুল। তবে চুলের বর্ণ কালো না— পিঙ্গল চুল— আপনি কি ওই শ্লোকটা জানেন? পিংগল চুলের শ্লোক?'

'না।'

উঁচ কপালী চিরলদাঁতি পিঙ্গল কেশ
ঘুরবে কন্যা নানান দেশ।

'এত সুন্দর মেয়ে আপনাকে অসুন্দর বলল কেন?'

'সবাই মিলে মশকরা করল। এর বেশি কিছু না। অতি রূপবতী মেয়েদের মনে নানান প্যাঁচঘোচ থাকে। রেহানা ছিল— অতি সরল। হাসিখুশি। অন্তর মায়াতে ভরতি। রেহানা খুব ভাগ্যবতীও ছিল। সে এসেছিল তার স্ত্রী ভাগ্য নিয়ে। বিয়ের পর পর ভালো একটা চাকরি পেলাম। মাল্টিনেশানাল কোম্পানির চাকরি— অনেক সুযোগ সুবিধা। সবচে বড় সুবিধা কোয়ার্টার আছে। তিন

রুমের কোয়ার্টার। রান্নাঘরটা শুধু ছোট। এ ছাড়া বড়ই ভালো ব্যবস্থা। দক্ষিণ দুয়ারী। কী যে সুখের জীবন শুরু হল ভাই সাহেব। নিজেকে মনে হত রাজা বাদশা। সহজভাবে তখন হাঁটাও ভুলে গেছি। স্টাইল করে হাঁটতাম। বিয়ের দুই বছরের মাথায় বড় মেয়ের জন্ম হল। মেয়ের নাম অহনা।

'আপনার দেওয়া নাম?'

'জিনা। আমার স্ত্রীর দূর সম্পর্কের এক খালাত ভাই— সফিকের দেওয়া নাম। সে আমার মেয়েটাকে অত্যন্ত স্নেহ করত। অহনা ডাকত না। সে ডাকত গহনা কন্যা অহনা।'

'সফিক সাহেব করতেন কী?'

'সে খুবই উদ্যোগি ছেলে ছিল। বুদ্ধি ছিল ক্ষুরধারের চেয়েও বেশি— ব্লেড ধার। অসম্ভব হাসিখুশি। গম্ভীর মুখে সে হাসির কথা বলতো— আমি আর রেহানা হেসে গড়িয়ে পড়তাম। আমরা দুজনই তাকে খুব পছন্দ করতাম। রেহানার চেয়ে বেশি পছন্দ করতাম আমি। ধরুন বাসায় কোনো একটা ভালা রান্না হয়েছে। আমি মেস থেকে সফিককে নিয়ে আসতাম। সে মেসে খেয়ে ফেলেছে তারপরেও নিয়ে আসতাম। বাসায় ভালোমন্দ কিছু রান্না হয়েছে আর আমি সফিককে খবর দিয়ে নিয়ে আসি নি। এ রকম কখনো হয় নাই।'

'সফিকের অংশটা এখন থাক। আপনার অংশটা বলুন।'

'জি ভাই সাহেব বলছি। একটু দম নিয়ে নেই। আরেকটা সিগারেট খেয়ে নেই।'

'গল্পটা কি অনেক লম্বা?'

'জিনা শেষ হয়ে এসেছে। বেশি হলে এক মিনিট লাগবে। গল্প শেষ করে আমি মাথা বানায়ে আপনাকে ঘুম পাড়িয়ে দিব।'

জয়নাল সাহেব সিগারেট খেলেন। চা খেলেন। মিষ্টি পান নিয়ে এসেছিলেন। পান খেলেন। গল্প আবার শুরু করলেন।

'বর্ষাকালের ঘটনা বুঝলেন হিমু ভাই। অফিসে গিয়েছি বৃষ্টিতে ভিজে। আমার বস হাসান সাহেব আমাকে দেখে বললেন--- একী অবস্থা। আপনার ছাতা নেই? আমি বললাম, জিনা সার।

উনি বললেন, 'বর্ষার দেশে বাস করেন— ছাতা নেই কেন?'

আমি বললাম, 'সার আমি খুব ছাতা হারাই। গত বছর তিনটা ছাতা হারিয়েছি। এই বৎসর ঠিক করেছি ছাতা কিনব না।'

হাসান সাহেব বললেন, 'এই বৎসরও কিনবেন এবং ছাতা যেন না হারায় সে জন্যে নাইলনের পাতলা দড়ি দিয়ে হাতের সঙ্গে বেঁধে রাখবেন।'

আমি বললাম, জি আচ্ছা সার। এখনই ছাতা কিনে নিয়ে আসছি।

হাসান সার বললেন— 'আরে কী আশ্চর্য। আপনি ঠাট্টা বুঝেন না নাকি? ঠাট্টা করছি। ছাতা কেনার কোনো দরকার নেই। আমার কাছে বাড়তি রেইনকোট আছে। আমি রেইনকোট দিয়ে দেব। আজ যে ভেজা ভিজেছেন। অসুখ করবে। যান বাসায় চলে যান। আজ আপনার ছুটি। আপনার জন্যে রেইনি ডে।'

হাসান সার আমাকে অসম্ভব স্নেহ করতেন। তাঁর স্নেহের ঋণ শোধ করা অসম্ভব। যাই হোক যে কথা বলছিলাম— আমি অসময়ে বাসায় ফিরে দেখি— সফিক আমাদের বাসায়। আমার খুবই ভালো লাগল— ভালো হয়েছে গল্প করা যাবে। আমি বললাম— 'সফিক কেমন আছ?'

সফিক বলল, 'ভালো। আপনি অসময়ে চলে এসেছেন কেন? অফিস ছুটি হয়ে গেছে।'

আমি বললাম, 'অফিস ছুটি হয় নি— আমার ছুটি। আমার রেইনি ডে।'

সফিক গম্ভীর গলায় বলল, 'অসময়ে দেখতে এসেছেন ভাবি কার সঙ্গে কী করছে? ভাবিকে আপনি সন্দেহ করেন? আপনার কি ধারণা ভাবি আমার সঙ্গে লটরপটর করে?

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'তার মানে?'

সফিক বলল, 'আপনি নানানভাবে আপনার স্ত্রীকে যন্ত্রণা দেন। তাঁকে মারধোর করেন। একবার গলাটিপে খুন করতে গিয়েছেন। আপনি কি জানেন ভাবি যদি থানায় গিয়ে কেইস করে তা হলে পুলিশ এসে আপনাকে ধরে নিয়ে যাবে। নারী নির্যাতন মামলায় আপনার দশ বছর জেল খাটতে হবে।'

আমি ভাবলাম সফিক রসিকতা করছে। কারণ রেহানা কিছুই বলছে না। কাজেই আমি হাসতে হাসতে বললাম— 'আমি জেলে গেলে তোমার ভাবিকে দেখবে কে?'

সফিক বলল, 'ভাবিকে দেখার লোক পাওয়া যাবে। আপনি আপনার নিজের কথা ভাবুন। আপনি তো ভাবিকে থ্রেটও করেছেন। আপনি বলেছেন— ভাবির মুখ আপনি এসিড দিয়ে ঝলসে দেবেন। বলেন নি?'

'কখন বললাম?'

'আমার সামনেই তো বলেছেন? বলেন নি? ভাবি যেমন শুনেছে। আমিও

শুনেছি।'

আমি বললাম, 'সফিক এই সব তুমি কী বলছ? ঠাট্টা করছ নাকি? এই জাতীয় ঠাট্টা ভালো না।

সফিক বলল, ঠাট্টা করছি না। আপনার সঙ্গে আমার ঠাট্টার সম্পর্ক না। আপনি আমার দুলাভাই না।

এই বলে সে উঠে চলে গেল। আমি রেহানাকে বললাম, 'ব্যাপার কী? সফিক এরকম করছে কেন?'

রেহানা শুকনো গলায় বলল, 'ও এরকম করছে কেন তা আমি কি করে বলব। ওর ব্যাপার ও জানে।'

এই বলে সে রান্নাঘরে ঢুকে গেল। আমি কিছুই বুঝলাম না। মন খুবই খারাপ। দুপুরে খাওয়াদাওয়া করে ঘুমালাম। সন্ধ্যাবেলায় উঠলাম। মাগরেবের নামাজ পড়ে অহনাকে নিয়ে খেলছি এমন সময় বাসায় পুলিশ আসল। আমাকে অ্যারেস্ট করল। বাড়ি সার্চ করল। আমার অফিসের ব্যাগে এক বোতল এসিড তারা খুঁজে পেয়ে গেল। তখনো আমি ভাবছি পুরো ব্যাপারটা দুঃস্বপ্ন। মন খারাপ করে ঘুমুতে গেছি এই জন্যে স্বপ্নে দেখেছি। রেহানা যে আমার বিরুদ্ধে মামলা করেছে আমি তার কিছুই বুঝতে পারি নি। পুলিশ এমন মার মারল— কী বলব ভাই সাহেব। মারের চোটে স্বীকার করলাম এসিড আমিই কিনেছি। পুলিশ কি করত জানেন? আমাকে চিৎ করে শুইয়ে এসিডের বোতলের মুখ খুলে ফেলত। তারপর বলত— তোর কেনা এসিডে তোর একটা চোখ গালিয়ে দেব। তখন বুঝবি কত ধানে কত চাল। হারামজাদা স্বীকার কর তুই এসিড কিনেছিস।

'খুবই অস্বাভাবিক ঘটনা।'

'জি অস্বাভাবিক। আমার পাঁচ বছরের সাজা হয়েছিল। জেলের বছর নয় মাসে হয় এই জন্যে চার বছরের মতো জেলে ছিলাম। তবে জেলে খারাপ ছিলাম না। বললে অবিশ্বাস্য লাগবে জেলে শান্তিতে ছিলাম। সারাদিন খাটাখাটনি করতাম রাতে ভালো ঘুম হত। এক ঘুমে রাত কাবার। জেল থেকে বের হয়ে খুবই কষ্টে পড়লাম। রেহানা সফিককে বিয়ে করে চলে গেছে অস্ট্রেলিয়া। আমার নেই চাকরি। দিনের পর দিন না খেয়ে থেকেছি।'

'মামলা যখন চলেছে তখনো কি বলেছেন এসিড আপনি কিনেছেন?'

'জি বলেছি। রেহানার উপর রাগ করেই বলেছি। ইত্তেফাকে আমার ছবিও

ছাপা হয়েছিল। পাষণ্ড স্বামী এই শিরোনামে।'

'আপনার গল্প শেষ হয়েছে?'

'জি ভাই সাহেব। এখন শুয়ে পড়েন আমি ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছি। আজ অন্য কায়দায় মাথা মালিশ করব। আঙুলের ডগা পানিতে ভিজিয়ে ভেজা আঙুলে চুলে বিলি কাটব। ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগবে, খুবই আরাম। পাঁচ মিনিটের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়বেন।'

আমি শুয়ে পড়লাম। জয়নাল সাহেব ভেজা আঙুলে চুলে বিলি কাটছেন। সত্যি সত্যি ঘুম চলে আসছে। আমি ঘুম ঘুম গলায় বললাম— 'আপনার স্ত্রীর সঙ্গে আপনার আর যোগাযোগ হয় নি?'

'জি না।'

'যোগাযোগের চেষ্টাও করেন নি?'

'করেছি। মেয়েটা কত বড় হল জানতে ইচ্ছা করে। কিন্তু ওদের ঠিকানা বের করতে পারি নি।'

'মেয়ের নাম কী বললেন যেন?'

'ভালো নাম তারা কী রেখেছে তা তো জানি না তবে ডাক নাম— অহনা। গহনার সঙ্গে মিলিয়ে অহনা। অহনা অহনা, পরবে সোনার গহনা। নামটা সুন্দর না?'

'অবশ্যই সুন্দর।'

'এখন মেয়েটার বয়স তেইশ। মেয়ে নিশ্চয়ই মায়ের মতো রূপবতী হয়েছে। চুলের রং পিঙ্গল হয়েছে কি না কে জানে। পিঙ্গল হলে সমস্যা। মেয়েকে দেশ বিদেশ ঘুরতে হবে। রেহানার চুল ছিল, এইজন্যে তাকে বিদেশে পড়ে থাকতে হয়েছে।'

জয়নাল সাহেব মাথায় আঙুল বুলাচ্ছেন। আমার চোখে নামছে রাজ্যের ঘুম। খুব হালকা সুরে বাঁশি বাজলে ভালো হত। শরীরের আরামের সঙ্গে যুক্ত হত মনের আরাম।

ঘুম ভেঙে দেখি আমার বিছানার পাশের চেয়ারে অতি বিখ্যাত এক ব্যক্তি বসে আছেন। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম। কবি খুব রাগী চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। চোখ ধ্বক ধ্বক করছে। এতটা রাগ কবিদের মানায় না। বিদ্রোহী কবিকেও মানায় না। আমি উঠে বসলাম। ভালোমতো তাকিয়ে দেখি যিনি বসে আছেন তিনি বিদ্রোহী কবি না— ফরিদা খালা। ভরাট গোলগাল মুখ—

বড় বড় চোখের কারণে ধান্ধা লেগে গিয়েছিল।

ফরিদা খালা কঠিন গলায় বললেন, এই আস্তাবলে তুই থাকিস? জায়গাটা তো ঘোড়া বাসেরও অযোগ্য। সারা মেঝেতে সিগারেটের টুকরা। একটা অ্যাসট্রে কিনতে কয় টাকা লাগে? গত এক বৎসরে এই ঘর কেউ ঝাঁট দিয়েছে বলে মনে হয় না।

আমি মধুর গলায় বললাম, কেমন আছ খালা? শরীর ভালো?

খালা সামাজিক আলোচনার ধার দিয়েও গেলেন না। আগের সূত্র ধরেই ধমকাতে লাগলেন—

'টেবিলে থাকে বই খাতা— তোর টেবিলে ময়লা কাপড়। একটা আলনা কি কেনা যায় না? আমি টাকা দিচ্ছি তুই এক্ষুনি আলনা কিনে আনবি?'

'জি আচ্ছা।'

'ঝাঁটা কিনবি— ঘর ঝাঁট দিবি। ফিনাইল দিয়ে ঘর মুছবি। সব আজই করবি।'

'আচ্ছা'

'কাপড় ধোয়ার সাবান কিনে আনবি। নিজের হাতে কাপড় কাচবি। একটা টেবিল ক্লথ কিনবি, অ্যাসট্রে কিনবি। ঘরে তো কোনো তোয়ালে দেখছি না গা মুছিস কী দিয়ে?'

'গা মুছি না।'

'একটা তোয়ালে কিনবি, গামছা কিনবি। তোষকের উপর শুয়ে আছিস— অস্বস্থি লাগে না। দুটা বেডশিট কিনবি। দুদিন পর পর বেডশিট বদলাবি। বালিশ থেকেও তো তূলা বের হচ্ছে। ফেলে দে এই বালিশ— এক্ষুনি ফেল।'

আমি জানালা দিয়ে বালিশ ফেলে দিলাম। খালা যে রাগ রেগেছে— তাৎক্ষণিকভাবে বালিশ বিসর্জনে সেই রাগ কিছু কমার কথা।

'দাঁত কেলিয়ে বসে আছিস কেন? হাত মুখ ধুয়ে আয়। তোর সঙ্গে জরুরি কথা। ভালো কথা হাত মুখ যে ধুবি— টুথপেস্ট ব্রাশ আছে?'

'কয়লা দিয়ে একটা ডলা দিলে কি চলবে?'

'হাসবি না খবর্দার। হাসির কোনো কথা আমি বলছি না।'

মনে হচ্ছে খালার রাগ খানিকটা পড়েছে— জোয়ারের পর সামান্য ভাটা। রাগ আরেকটু কমানোর জন্যে বললাম, চা খাবে খালা?

'না।'

'কবি নজরুল খুব চা খেতেন। তিনি বলতেন চায়ে 'না' নাই। দিনে সত্তুর কাপ চা খাওয়ার রেকর্ডও তাঁর আছে।'

খালা অবাক হয়ে বললেন, 'কবি নজরুলের চা খাওয়ার সাথে আমার চা খাবার সম্পর্ক কী?

'তুমি দেখতে অবিকল কবি নজরুলের মতো।'

'তার মানে?'

'চুলগুলি ববকাট করলে তুমি পুরোপুরি নজরুল। নজরুলকে নিয়ে অন্নদাশংকর রায়ের একটা বিখ্যাত কবিতা আছে। কবিতাটা জান খালা?'

ভুল হয়ে গেছে বিলকুল
সব কিছু ভাগ হয়ে গেছে
ভাগ হয়নি কো নজরুল।

খালা রাগী গলায় বললেন, যার সঙ্গে ইচ্ছা ফাজলামি করিস আমার সঙ্গে করবি না। আমি তোর ছোটশালী না, সম্পর্কে আমি তোর খালা।

'একজন বিখ্যাত মানুষের চেহারার সঙ্গে তোমার চেহারার মিল এতে তো আনন্দিত হবার কথা। তুমি রাগ করছ কেন?'

'আমি কি ব্যাটা ছেলে?'

'এই বিষয়ে কবি নজরুলেরই কবিতা আছে— আমার চক্ষে পুরুষ রমণী কোনো ভেদাভেদ নাই। তা ছাড়া খালা, পুরুষ রমণীর প্রভেদটা হল বাহ্যিক। শারীরিক। মানুষের আসল পরিচয় তার আত্মায়। আত্মার কোনো নারী পুরুষ নেই। পুরুষের আত্মাও যা নারীর আত্মাও তা।'

'আমার সাথে বড় বড় কথা বলবি না। আমি আশা না যে তুই যা বলবি তাই হাসি মুখে মেনে নিব আর মনে মনে বলব— "হিমু সাহেব কত বড় জ্ঞানী। কত জ্ঞানের কথা জানেন।" একটা থার্ড গ্রেড ফাজিলের সাথে তোর যে কোনো বেশকম নাই, এটা অন্য কেউ না বুঝলেও আমি বুঝি। যা হাত মুখ ধুয়ে আয়। তোর ফিলসফির কথা শোনার জন্যে আমি আসি নি।'

আমি হাত মুখ ধুয়ে ফিরে এসে দেখি অতি অল্প সময়ে ফরিদা খালা অসাধ্য সাধন করেছেন। ঝাঁটা যোগাড় করে নিজেই ঘর ঝাঁট দিয়েছেন। টেবিলের ওপর রাখা কাপড় লন্ড্রিতে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আমার চৌকিটা ছিল ঘরের মাঝামাঝি

সেটা সরিয়ে দিয়েছেন, এতে ঘরটাকে আগের চেয়ে বড় মনে হচ্ছে।

আমাকে দেখেই খালা বললেন— সন্ধ্যাবেলা রশীদকে জিনিসপত্র দিয়ে পাঠিয়ে দেব। ও সব ঠিকঠাক করে দেবে। তোর ঘরে তো ফ্যানও নেই। প্রচণ্ড গরমে ঘুমাস কী করে? একটা টেবিল ফ্যানও দিয়ে দেব। আর কী লাগবে বল?

'কিছু পাঠাতে হবে না খালা। এই মেসে আগামীকাল থাকব কি না তার নাই ঠিক।'

'যাবি কোথায়?'

'এখনো ঠিক করি নি।'

'এই মেসে অসুবিধা কী?'

'অসুবিধা আছে। মেসটায় শনির নজর পড়েছে। পুলিশ এসে মেসের লোকজন ধরে নিয়ে যাচ্ছে। হেভি পিটুনি দিচ্ছে।'

'কাকে ধরে নিয়ে গেল?'

'মেসের ম্যানেজার আবুল কালাম সাহেবকে ধরে নিয়ে গেছে। অনেস্ট লোক। সাতে-পাঁচে নাই। এমন মার দিয়েছে যে এক মারের চোটে ডিসঅনেস্ট হয়ে গেছে।'

'জহিরকে বলি সে ছাড়িয়ে নিয়ে আসবে।'

'জহির কে?'

'জহিরকে তুই চিনিস না— তোকে ধরে একটা আছাড় দিব। আমার ছোট ভাই।'

'উনি ছাড়িয়ে নিয়ে আসবেন কীভাবে? প্রধানমন্ত্রীর আত্মীয় স্বজনের ইনফ্লুয়েন্স ছাড়া পুলিশের হাত থেকে ছাড়া পাওয়া মুশকিল। তোমরা নিশ্চয়ই প্রধানমন্ত্রীর আত্মীয় না?'

'গাধার মতো কথা বলিস না তো— জহির অবশ্যই ছাড়াতে পারবে। সে পুলিশের আই জি না? পত্রিকায় জহিরের ছবি ছাপা হয়েছে— তার জীবনী পর্যন্ত ছেপেছে। তুই টেলিফোন করে বলে দে তা হলেই হবে। তোকে সে খুবই পছন্দ করে। ওর পার্সোনাল নাম্বার তোকে দিয়ে যাচ্ছি।'

'আচ্ছা দিও— এখন বল আমার কাছে কেন এসেছ? রাগারাগি না করে ঠাণ্ডা মাথায় বল।'

খালা কঠিন গলায় বললেন, আশার মাথায় তুই কী ঢুকিয়েছিস? ও বলছে ওর মাথায় কী নাকি ঢুকে গেছে— "ফুল-ফল।" একটা বাচ্চা মেয়ের মাথায় ফুল-ফল

ঢুকানোর মানে কী? ও তো তোর কোনো ক্ষতি করে নি। তুই তার ক্ষতি করলি কেন? কী মনে করে বাচ্চা একটা মেয়ের মাথায় ফুল-ফল ঢুকিয়ে দিলি?

'আমি মাথায় কিছু ঢুকাই নি খালা। ফুল-ফল অটো সিস্টেমে তার মাথায় ঢুকেছে। ওর অবস্থা কী?'

'আধমরা হয়ে গত ছদিন ধরে বিছানায় পড়ে আছে। কিছুই খাচ্ছে না।'

'চিকিৎসা করছ না?'

'নিউজার্সিতে ওদের ফ্যামিলি ফিজিশিয়ানের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। তিনি টেলিফোনে অষুধ পত্র দিয়েছেন। সবই মনে হয় ঘুমের অষুধ। সারাক্ষণ ঘুমিয়েই থাকে। মাঝেমধ্যে ঘুম ভাঙে তখন বলে, এখানো মাথার মধ্যে ফুল-ফল আছে। কী যে যন্ত্রণায় পড়েছি।'

'যন্ত্রণাতো বটেই?'

'অনেক অদ্ভুত রোগের কথা শুনেছি। এরকম তো কখনো শুনি নি।'

'বড়লোকের বড় রোগ। —মাথার মধ্যে কথা ঢুকে যাওয়া। ছোটলোকের ছোট রোগ— পাতলা পায়খানা, দাউদ বিখাউজ। তুমি এত চিন্তিত হয়ো না তো খালা। সেরে যাবে।'

'বাইরের একটা মেয়ে প্রথম বাংলাদেশে শখ করে এসেছে। দেখ তো এখন ঝামেলাটা। আমি আগামী শনিবার ওকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। এত ঝামেলার আমার দরকার নেই— "যত মরা মরে। রায় বাড়িতে এসে পুড়ে।" সব ঝামেলা আমার ঘাড়ে। আমার বাড়িটা হয়েছে রায় বাড়ি।'

'আমার কাছে তোমার আসার উদ্দেশ্য কি এটাই? শনিবার আশা চলে যাচ্ছে এই খবর দেওয়া? নাকি আরো কিছু আছে?'

'আশা তোকে একটা চিঠি লিখেছে। আমি চিঠিটা নিয়ে এসেছি।'

'চিঠি অন্য কাউকে দিয়ে পাঠাতে পারতে। তোমার নিয়ে আসার তো দরকার নেই। তোমার আসার উদ্দেশ্যটা বল।'

খালা শান্ত গলায় বললেন, তুই আশার সঙ্গে আর কখনো দেখা করবি না। কোনো যোগাযোগ রাখবি না। তোকে টাকা দিচ্ছি— তুই ঢাকার বাইরে কোথাও চলে যা। স্টিমারে করে পটুয়াখালি চলে যা। সেখান থেকে যাবি কুয়াকাটা। কুয়াকাটায় পর্যটনের মোটেল আছে। মোটেল বুক করে দেব। রাজার হালে থাকবি।

'আমাকে চলে যেতে হবে কেন? সমস্যাটি কী?'

'আশা তোর প্রসঙ্গে তার মাকে টেলিফোনে কী সব বলেছে। তিনি আমার

সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। খুবই চিন্তিত। কান্নাকাটিও করেছেন। আমার হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। কী বিপদে পড়লাম।'

আমি আনন্দিত গলায় বললাম, আশা কি আমার প্রেমে পড়েছে খালা?

খালা তিক্ত গলায় বললেন, তোর প্রেমে পড়বে কেন? তোর কোন জিনিসটা আছে প্রেমে পড়ার মতো? ছাল বাকল নেই একটা মানুষ।

আমি গলা নিচু করে বললাম— সাধারণ মেয়েরা ছালবাকল নেই ছেলের প্রেমে কখনো পড়বে না। তারা ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার খুঁজবে। টাকা-পয়সা খুঁজবে। ঢাকায় বাড়ি আছে কিনা দেখবে। কিন্তু অতি বিত্তবান মেয়েরা ছালবাকল নেই ছেলেদের প্রতি এক ধরনের মমতা পোষণ করবে। অসহায়ের প্রতি করুণা। সেই করুণা থেকে প্রেম। দুই এ দুই বাইশ।'

'দুই এ দুই এ বাইশ হোক আর একুশ হোক। তুই এই মেয়ের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ রাখবি না। তুই পালিয়ে যাবি।'

'কুয়াকাটায় পালিয়ে গিয়ে সূর্যাস্ত সূর্যোদয় দেখব?'

'দেখতে চাইলে দেখবি, আর মোটেলের ঘরে বসে থাকতে চাইলে বসে থাকবি। আমার কথা হচ্ছে এই মেয়ের কাছ থেকে দূরে চলে যাওয়া।'

আমি শান্ত গলায় বললাম, খালা এতে লাভ হবে না।

'লাভ হবে না কেন?'

'আশা মেয়েটার স্বভাব চরিত্র যা দেখছি— এই কাণ্ড করলে তার প্রেম আরো বেড়ে যাবে। অবশ্যই সে খুঁজে খুঁজে আমাকে বের করে ফেলবে। কুয়াকাটায় উপস্থিত হবে। সমুদ্র তীরে নায়ক নায়িকার মিলন। ব্যাকগ্রাউন্ডে রবীন্দ্র সংগীত— বধূ কোন আলো লাগল চোখে।

খালা কঠিন গলায় বললেন— নায়ক নায়িকার মিলন মানে? ফাজলামি কথা পুরোপুরি বন্ধ। জটিল একটা সমস্যা হয়েছে সেই সমস্যা কীভাবে মেটানো যায় সেটা বল। সব রোগের অষুধ আছে। এই রোগের কী অষুধ তুই বল? তুই রোগের জীবাণু সাপ্লাই দিয়েছিস। অষুধও তুই দিবি।

'প্রথম যে কাজটা করতে হবে তা হল মেয়েটার প্রেম ভাবটা কমাতে হবে। তার কাছ থেকে পালিয়ে গিয়ে সেটা করা যাবে না। তার সঙ্গে ছ্যাবলামি করতে হবে। যতই ছ্যাবলামি করা হবে ততই প্রেম ভাব কমবে।

'কী রকম ছ্যাবলামি?'

'গদগদভাবে কথা বলতে হবে। ভাবটা এরকম দেখাতে হবে যেন আমি

তার প্রেমে পাগল। তারপর ফট করে একদিন বিয়ের প্রপোজল দিতে হবে। বাংলা ছবির নায়কের মতো কাঁদো কাঁদো গলায় বলতে হবে— আশা, ও আমার জানপাখি তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচব না। তুমি যদি আমাকে বিয়ে না কর তা হলে আল্লাহ্‌র কসম কোনো একটা পাঁচ টনি ট্রাকের সামনে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে যাব।

'এমন অশালীন কথা তুই আমার সামনে বলতে পারলি?'

'পারলাম কারণ কথাগুলি তোমার কাছে অশালীন সুনালেও সমস্যা সমাধানের এই হচ্ছে পথ।'

'তোর এইসব কথাবার্তা শুনে আশার প্রেম কমে যাবে?'

'অবশ্যই কমবে। অতি দ্রুত কমবে। বিয়ের কথাটা যেই বলব ওম্নি প্রেম জ্বর ধাই ধাই করে নামতে থাকবে, তারপর দিতে হবে আসল অষুধ।'

'আসল অষুধটা কী?'

'বিয়ের কথা বলার পরপরই বলতে হবে— "আশা শোন তোমাকে বিয়ে করলে কি আমি এটোমেটিক্যালি আমেরিকার গ্রিন কার্ড পাব? নাকি তার জন্যে আবার আরো ঝামেলা আছে? আমাকে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দাও তো।" আমার এই কথা শুনে আশার আক্কেল গুড়ুম হবে। সে বুঝবে আমার আসল উদ্দেশ্য হল গ্রিন কার্ড। সিন্দাবাদের ভূতের মতো স্ত্রীর কাঁধে সওয়ার হয়ে আমেরিকা যাত্রা।'

খালা কিছু বলছেন না। এক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। আমার কথা বিশ্বাস করতে পারছেন না। আবার অবিশ্বাসও করতে পারছেন না।

আমি বললাম, খালা এখন বল পরিকল্পনা মতো এগুব? লদকালদকি টাইপ কথাবার্তা বলা শুরু করব?

খালা ক্লান্ত নিশ্বাস ফেলে বললেন, তোকে কিচ্ছু করতে হবে না। তুই চুপ করে থাক।

'এখানেই থাকব? না কুয়াকাটার দিকে রওনা হয়ে যাব?'

'আপাতত এইখানেই থাক। আমি পরে তোর সঙ্গে যোগাযোগ করব। নে তোর চিঠি নে।'

'খালা চিঠিতে রোমান্টিক কোনো ডায়ালগ কি আছে? আমি জীবনে কোনো প্রেমপত্র পাই নি। প্রেমের ডায়ালগ যদি এই চিঠিতে থাকে তা হলে এটাই হবে আমার জীবনের প্রথম প্রেমপত্র। কিছু কি আছে?

'তোর কাছে লেখা চিঠি আমি কি করে বলব প্রেমের ডায়ালগ আছে কি না।'

'এই চিঠি না পড়ে তুমি আমাকে দিচ্ছ এটা বিশ্বাসযোগ্য না বলেই জিজ্ঞেস

করছি। প্রেমের কথাবার্তা কি আছে?'

খালা বিরক্ত গলায় বললেন— 'না এইসব কিছু নেই। গদগদ টাইপ প্রেমের চিঠি লেখার মেয়ে আশা না।'

খালা উঠে দাঁড়ালেন। তাঁকে খুবই চিন্তিত মনে হচ্ছে। তাঁর ঠোঁট নড়ছে। মুখ দিয়ে শব্দ বের হচ্ছে না। আমি আশার চিঠি পড়তে শুরু করলাম। ইংরেজিতে লেখা চিঠি। অনুবাদ করলে এরকম দাঁড়ায়।

হিমু সাহেব
আমি এখন মাথার ভেতর একটা পোকা নিয়ে বিছানায় শুয়ে আছি। পোকাটা ক্রমাগত গান করছে— "ফুলের মতো ফল। ফলের মতো ফুল।" ভয়ঙ্কর এবং কুৎসিত এই চক্রসংগীত। মাঝে মাঝে ইচ্ছা করছে দেয়ালে মাথা ঠুকে মাথা ফাটিয়ে ফেলি। তারপর একটা চিমটা দিয়ে পোকাটা বের করে ফেলি। তা সম্ভব হচ্ছে না বলেই জটিল ধরনের সব সিডেটিভ খেয়ে ঘুমুচ্ছি। পোকা কিন্তু আমার ঘুমের ভেতরও গান গেয়ে যাচ্ছে।

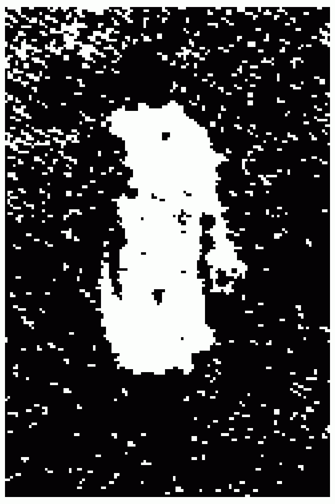
দয়া করে আমার এই ব্যাপারটা নিয়ে আপনি চিন্তিত হবেন না। অষুধ পত্র চলছে পোকা যথাসময়ে মারা যাবে। নতুন কোনো পোকা না ঢোকা পর্যন্ত সময়টা ভালোই কাটবে।

ওই বর্ষার দিনে আমি খুবই আনন্দ করেছি। জ্বর নিয়ে বের হয়েছিলাম। জ্বর সেরে গেছে। আপনার সঙ্গে পাইপে বসে বৃষ্টি দেখা হল না— এই দুঃখটা দূর হচ্ছে না।

ঝর-ঝর করে বৃষ্টি পড়ছে আমরা দুজন পাইপে বসে বৃষ্টি দেখছি এই দৃশ্যটা আমি কল্পনায় অনেকবার দেখেছি। বাস্তব কল্পনাকে ছাড়িয়ে যাবে কিনা এটাই আমার দেখার ইচ্ছা। আমার কল্পনাশক্তি ভালো বলেই বাস্তব কখনোই আমার কল্পনাকে অতিক্রম করতে পারে না। যাই হোক মাথা থেকে পোকাটা বের হওয়া মাত্র আমি আপনাকে নিয়ে পাইপে ঢুকব। তখন যদি বৃষ্টি নাও থাকে আপনি দমকলকে খবর দেবেন যেন দমকল বাহিনী নকল বৃষ্টি তৈরি করে দেয়।

একটা ছোট্ট অনুরোধ কি আমি আপনাকে করতে পারি? আমাকে এসে দেখে যান না? প্লিজ।

বিনীতা
আশা।



আবুল কালাম সাহেবকে দেখতে থানায় উপস্থিত হলাম। ডিউটি অফিসার খুবই ব্যস্ত। এই ব্যস্ততার ভেতরও তিনি চট করে আমাকে দেখে আবার ব্যস্ত হয়ে গেলেন। তাঁর ব্যস্ততা নাকের লোম ছেড়ায় সীমাবদ্ধ। এই মহৎ কর্মটি তিনি বেশ আয়োজন করে করছেন। তাঁর সামনে ছোট্ট একটা আয়না। একপাশে কেচি এবং চিমটা। দুটা মাত্র গর্ত দিয়ে আল্লাহ্ তাকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন বলে তিনি ঝামেলায় পড়ে গেছেন। হাত তিনটা থাকলে তাঁর জন্যে সুবিধা হত। এক হাতে আয়না ধরে থাকতেন অন্য দুহাত দিয়ে চিমটা এবং কাঁচি ব্যবহার করতেন।

আমি ডিউটি অফিসারের সামনে দাঁড়িয়ে অতি বিনীত ভঙ্গিতে বললাম, 'স্যার স্লামালিকুম।'

ডিউটি অফিসার হাত থেকে আয়না নামিয়ে ভুরু কুঁচকে বললেন, 'কী চাই।'

আমি তাঁর সামনের চেয়ারে বসতে বসতে হাসি মুখে বললাম, 'গল্প করতে এসেছি স্যার। কিছুক্ষণ আপনার সঙ্গে গসিপিং করব যদি অনুমতি দেন।'

ডিউটি অফিসার হুঙ্কার দিয়ে বললেন, গসিপিং করব মানে? কিসের গসিপিং?

আমি মুখের হাসি আরো বিস্তৃত করে বললাম— 'আপনি তো স্যার অবসর আছেন, নাকের লোম ফেলছেন। আমিও অবসর। কাজেই আসুন কিছুক্ষণ গসিপিং করি।'

'আপনি কে?'

'আমি একজন কবি। আমার কথা মনে হয় বিশ্বাস হচ্ছে না। পুরোনো ফাইল ঘেঁটে দেখতে পারেন। তিন বছর আগে আপনাদের হাজতে চারদিন ছিলাম। সেখানে আমার পরিচয় লেখা আছে— কবি।'

'কবি?'

'জি স্যার কবি। পোয়েট। আমি রবীন্দ্রনাথ ঘরানার কবি। মিল দিয়ে দিয়ে কবিতা লেখি। যেমন—

পুলিশ
ফুলিশ

গরু
সরু

সিঁড়ি
কিড়িকিড়ি...

ডিউটি অফিসার নড়ে চড়ে বসলেন। ঝড় আসার পূর্ব লক্ষণ। বাঘ শিকারের উপর ঝাঁপ দেওয়ার আগে মাটিতে লেজের একটা বাড়ি দেয়। পুলিশও নড়ে চড়ে বসে।

আমি মধুর গলায় বললাম, 'স্যার দুকাপ চা দিতে বলুন। আমারটায় চিনি একটু বেশি— তিন চামচ। কবিগুরু বরীন্দ্রনাথ চায়ে চিনি বেশি খেতে খেতেন বলে আমি সবদিকেই উনাকে অনুসরণ করার চেষ্টা করছি। চিনি নিয়ে কবিগুরু একটা গানও লিখেছেন। গানটা কি শুনেছেন?

ডিউটি অফিসার নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরেছেন। পুলিশের ঠোঁট কামড়ানোর মানে হল— 'দশ নম্বর সিগন্যাল। তুফান এল বলে।' আমি শান্ত গলায় বললাম, চিনি নিয়ে লেখা রবীন্দ্রনাথের গানটা হচ্ছে—

"চিনি গো চিনি তোমারে
ওগো বিদেশিনি।"

অর্থাৎ তিনি বিদেশী চিনির কথা বলছেন। দেশি চিনি ময়লা লালচে ধরনের। বিদেশী চিনি ফকফকা সাদা।

ডিউটি অফিসার কলিং বেলে চাপ দিলেন। এখন তাঁর মুখে সামান্য হাসি দেখা গেল। মাকড়সার জালে পোকা আটকে পরার পর মাকড়সা পোকার দিকে তাকিয়ে যেরকম হাসি দেয় সেরকম হাসি।

আমিও হাসলাম। তবে হাসি তৎক্ষণিকভাবে বন্ধ করে বললাম— 'এই গানটার ইংরেজি শুনবেন— চিনিগো চিনি তোমারে Sugar Sugar you...'

কলিং বেল শুনে রাইফেল কাঁধে এক পুলিশ উপস্থিত হল। বেচারা অতি

দুর্বল টাইপ। রাইফেলের ভারে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না। কুঁজো হয়ে গেছে। এই পুলিশকে বাইরে ডিউটিতে পাঠানো ঠিক হবে না। প্রথম সুযোগেই সে রাইফেল কোনো ডাস্টবিনে ফেলে বাড়ি চলে যাবে ঘুমুবার জন্যে।

দুর্বল পুলিশ খুবই কষ্ট করে ডিউটি অফিসারকে একটা স্যালুট দিল। ডিউটি অফিসার আমাকে দেখিয়ে দিয়ে বললেন— 'একে নিয়ে লকারে ঢোকাও। বড় সাহেব আসুক তারপর ব্যবস্থা নিব। হারামজাদার তেল বেশি হয়েছে— তেল কমায়ে দেই।'

আমি হাজতে ঢুকে পড়লাম। হাজতে আমাকে নিয়ে মোট ছজন। আমি সবার দিকে তাকিয়ে রাজনৈতিক নেতাদের মতো হাত নেড়ে বললাম— 'শুভ সকাল। আপনারা সবাই ভালো? কেউ জবাব দিল না। শুধু আবুল কালাম সাহেব চোখ পিটপিট করতে লাগলেন। মনে হল তিনি চোখে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন না। ভদ্রলোক যে ভালো ডলা খেয়েছেন তা বোঝা যাচ্ছে। তাঁর একটা চোখ বড় একটা ছোট। কপালের একই অংশ নৈনিতালের আলুর মতো ফুলে আছে। দেখে মনে হচ্ছে পার্মানেন্ট ব্যবস্থা। এই ফোলা কখনো কমবে না। বাকি জীবন কপালে আলু নিয়ে ঘুরতে হবে। আগে পুলিশের মারের মধ্যে রাখ ঢাক ছিল। দেখে কিছু বোঝা যেত না। মারটাও তার শিল্পকর্মের পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল— এখন সে অবস্থা নেই। ইচ্ছা হল মেরে ফেললাম— পানির ট্যাংকে ফেলে দিলাম। ডেডবডি প্রকাশ হয়ে পড়লেও ক্ষতি নেই— পত্রিকায় বিবৃতি দেওয়া হবে— এই লোক পানির ট্যাংকে গিয়েছিল পানি খেতে। তারপর পা পিছলে ট্যাংকে পড়ে গেছে। সেখানেই মৃত্যু।

ডাক্তাররা সুরাতহাল করবেন। তারাও রিপোর্ট দেবেন— লাংসে পানি পাওয়া গেছে। অর্থাৎ পানিতে ডুবে মৃত্যু। মাথায় আঘাতের চিহ্ন আছে— পানির ট্যাংকের ঢাকনায় ধাক্কার কারণে তা হতে পারে।

'হিমু সাহেব।'

'জি।'

'আমাকে চিনতে পারছেন? আমি আবুল কালাম।'

'চিনতে পারছি। কেমন আছেন?'

আবুল কালাম জবাব দিলেন না। শূন্য দৃষ্টিতে তাকালেন। আমি বললাম, 'আপনাকে ছাড়িয়ে নিতে এসেছি।'

আবুল কালাম বিড়বিড় করে বললেন, 'শুকরিয়া।'

বেচারা যে ঘোরের মধ্যে চলে গেছে এটা স্পষ্ট। যে ছাড়িয়ে নিতে এসেছে সে আছে হাজতে এই সমস্যা তাঁকে বিচলিত করছে না। তবে অন্য হাজতিরা

এখন আমাকে কৌতূহলী চোখে দেখছে। এদের মধ্যে একজনের চেহারা এবং কাপড়চোপড় শোভন শ্রেণীর। চোখে সোনালি রঙের চশমা। কলেজের ভাইস প্রিন্সিপ্যাল টাইপ চেহারা। তিনি কাছে ঝুঁকে এলেন। আমাদের কথাবার্তা শোনার চেষ্টা। আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে বললাম, 'ভাই সাহেব ভালো আছেন?' তিনি জবাব দিলেন না। মুখ অন্যদিকে ফিরিয়ে নিলেন।

আমি আবুল কালাম সাহেবের কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বললাম, 'বেশি মেরেছে?'

আবুল কালাম ক্ষীণ গলায় বললেন, 'জি না। সন্ধ্যার পর মারবে।'

আমি বললাম, 'ঘণ্টা দু-একের মধ্যে ছাড়া পাবেন। সন্ধ্যা পর্যন্ত থাকতে হবে না।'

আবুল কালাম ফিসফিস করে আবারো বললেন, 'শুকরিয়া।'

'হাজত থেকে বের হয়েই গরম পানি দিয়ে একটা গোসল দেবেন। সাবান ডলা দিয়ে হেভি গোসল। তারপর দুটা প্যারাসিটামল খাবেন, একটা খাবেন সিডাকসিন। গনিমিয়ার চায়ের দোকান থেকে চা আনিয়ে দেব। মগভরতি এক মগ চা খাবেন। সঙ্গে একটা বেনসন সিগারেট— দেখবেন কেমন লাগে।

'জি আচ্ছা। শুকরিয়া।'

'একটু পরপর শুকরিয়া বলছেন কেন? ঘটনা কী?'

আবুল কালাম ফিসফিস করে বললেন, 'মাথা আউলায়ে গেছে হিমু ভাই। কী বলতেছি না বলতেছি নিজেও জানি না। ছোট বেলায় মায়ের হাতে মার খেয়েছি তারপর পুলিশের কাছে মার খেলাম। কলিজা নড়ে গেছে। সন্ধ্যার পর নাকি আসল মার দিবে। আসল মারা মারার যে লোক তার ডিউটি সন্ধ্যার পর।'

'পুলিশ ধরেছে কেন?'

'মেসের মালিক সবুর সাহেবের শালার দুই লাখ টাকা চুরি গেছে। তাঁর ধারণা টাকাটা আমি চুরি করেছি। পুলিশকে পাঁচ হাজার টাকা দিয়েছেন টাকা উদ্ধারের জন্য। উদ্ধার হলে আরো দশ দিবে এই হল কনট্রাক্ট। টাকা উদ্ধারের জন্যে পুলিশ দফায় দফায় মারছে। সন্ধ্যার পর ফাইন্যাল মারা মারবে।'

'এতক্ষণ পর্যন্ত কি হয়েছে সেমি ফাইন্যাল।'

'জি। মনে হয় রাতে জানেই মেরে ফেলবে।'

'টাকা কি আপনি নিয়েছেন?'

'জি না ভাইজান। আমি ছোটখাটো চুরি করি। মেসের বাজার করতে গিয়ে

তিরিশ টাকা সরায়ে ফেললাম। হেঁটে কাচা বাজারে যাই— বিলের সময় লেখি রিকশা ভাড়া পনরো টাকা এইসব করি। বড় চুরি কী ভাবে করব বলেন? বড় চুরি করতে বড় কইলজা লাগে। আমার কইলজা ছোট। অতিরিক্ত ছোট। ভয়ে অস্থির হয়ে থাকি। আমার পেটে পুলিশ হাঁটু দিয়ে গুতা দিয়েছে। ব্যথা সেরকম পাই নাই, কিন্তু ভয়ের চোটে পিসাব করে দিয়েছি। বালতি দিয়ে পানি এনে সেই পিসাব নিজেই ধুয়েছি। কী লজ্জার কথা বলেন দেখি।'

'আপনার পিসাব আপনি ধুয়েছেন এতে লজ্জার কী আছে? আপনার পেসাব যদি ওসি সাহেব ধুতেন— সেটা ছিল লজ্জার।'

'তাও ঠিক। ভাই সাহেব সন্ধ্যার সময় যখন মারতে নিয়ে যাবে তখন বোধহয় মেরেই ফেলবে।'

'না তার আগেই আপনি ছাড়া পেয়ে যাবেন।'

'কীভাবে?'

'ব্যবস্থা করে রেখেছি। আই জি সাহেব টেলিফোন করবেন। টেলিফোন তিনি বলবেন, আবুল কালাম অতি সৎ চরিত্রের মানুষ। আমার পূর্ব পরিচিত। এতেই কাজ হবে।'

'শুকরিয়া।'

'রাতে ঘুম হয় নি?'

'জি না।'

'এখন ছোট্ট একটা ঘুম দিন। আই জি সাহেবের টেলিফোন এলে আমি ডেকে তুলব।'

'শুকরিয়া।'

আবুল কালাম সাহেব চোখ বন্ধ করে ফেললেন। যেভাবে নিশ্বাস পড়ছে তাতে মনে হয় ঘুমিয়েই পড়েছেন। ভাইস প্রিন্সিপালের মতো দেখতে ভদ্রলোক আবারো আমাদের দিকে ঝুঁকে এসেছেন। আড় চোখে তাকিয়ে আছেন ঘুমন্ত আবুল কালামের দিকে। আমি বললাম, 'কিছু বলবেন?'

ভদ্রলোক না সূচক মাথা নাড়লেন। আমি বললাম, 'আপনাকে পুলিশ ধরেছে কেন?'

ভদ্রলোক অতি মিষ্টি গলায় বললেন, 'খুনের আসামী হিসাবে ধরেছে।'

'খুন করেছেন?'

'হ্যাঁ করেছি।'

'কাকে খুন করেছেন?'

'করেছি একজনকে। তার নাম বলার দরকার দেখছি না। যে চলে গেছে তার নাম দিয়ে দরকার কী? He does not exist.'

'আপনার নাম কী?'

ভদ্রলোক জবাব দিলেন না। পকেটে হাত দিয়ে সিগারেট বের করলেন। লাইটার দিয়ে সিগারেট ধরিয়ে সহজ স্বাভাবিক গলায় বললেন— 'আপনার এই লোক সারারাত ছটফট করেছে। এখন আপনাকে দেখে শান্তি পেয়ে ঘুমাচ্ছে। মিথ্যা কথা বলে আপনি তাকে ঘুম পাড়িয়ে দিলেন। মিথ্যার শক্তি যে সত্যের চেয়ে বেশি এটা বুঝলেন?'

'বোঝার চেষ্টা করছি।'

'এই যুগে সত্যি কথা কেউ বিশ্বাস করে না। সত্যি কথা বললে সন্দেহের চোখে তাকায়। আমি যখন বললাম, খুন করেছি আপনি বিশ্বাস করেন নি। সন্দেহের চোখে তাকিয়েছেন। অথচ আমি সত্যি খুন করেছি।'

আমি চুপ করে ভদ্রলোকের কথা শুনছি। ভদ্রলোক কী সুন্দর করেই না কথা বলছেন। হাসিহাসি মুখ চোখ ঝিকমিক করছে।

ভদ্রলোক আধ খাওয়া সিগারেট আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন— খান সিগারেট খান। আপনি কী করে মিথ্যা কথা বলে একটা লোককে ঘুম পাড়িয়ে দিলেন সেটা মোটামুটি অবাক হয়েই দেখলাম। নাম কী আপনার?

'হিমু।'

'শুধু হিমু?'

'জি।'

'পুলিশ আপনাকে ধরেছে কেন?'

'আমি আবুল কালাম সাহেবকে ছাড়িয়ে নিয়ে যেতে এসেছিলাম। পুলিশ আমাকে লকারে ঢুকিয়ে দিয়েছে।'

ভদ্রলোক মনে হল আমার কথায় খুব মজা পেলেন। শরীর দুলিয়ে হাসতে লাগলেন। খুবই অন্যরকম হাসি। সমস্ত শরীর কাঁপছে, কিন্তু হাসির কোনো শব্দ আসছে না। চোখ দুটিতে কোনো হাসি নেই। চোখ স্থির।

'হিমু সাহেব!'

'জি।'

'আমার নাম সাদেক চৌধুরী। আমার এই কার্ডটা রেখে দিন। প্রয়োজন

পড়লে যোগাযোগ করবেন।'

'শুকরিয়া।'

'শুকরিয়া বলা কি আপনি আপনার বন্ধুর কাছে শিখেছেন?'

'জি।'

'আমি আপনাকে আর আপনার বন্ধুকে ছাড়ানোর ব্যবস্থা করতে পারি। করব?'

'দরকার নেই। আমরা ঘন্টা দু-একের মধ্যে ছাড়া পাব।'

'আই জি সাহেব টেলিফোন করে ছাড়াবেন?'

'জি।'

ভদ্রলোক আবারো তার বিচিত্র হাসি হাসতে লাগলেন। তাঁর এ বারের হাসি দেখে গা শিরশির করে উঠল। নিঃশব্দ হাসির বিষয়ে বাবা লিখে গিয়েছিলেন।

"যে মানুষ নিঃশব্দে হাসে তাহার বিষয়ে খুব সাবধান। দুই ধরনের মানুষ নিঃশব্দে হাসে— অতি উঁচু স্তরের সাধক এবং অতি নিম্ন শ্রেণীর পিশাচ চরিত্রের মানুষ। এই দুই এর ভেতর প্রভেদ করা তেমন জটিল কর্ম নহে। ঘ্রাণের মাধ্যমে এই দুই শ্রেণীকে আলাদা করা যাইবে। হাস্যকালীন সময়ে সাধু মানুষের গাত্র হইতে সুঘ্রাণ পাওয়া যাইবে। পিশাচ শ্রেণীর মানুষের গায়ে পাওয়া যাইবে তিক্ত ও কটুস্বাদময় দূষিত গন্ধ। সাধু মানুষ যেমন সংখ্যায় অতি নগন্য তেমনি পিশাচ শ্রেণীর মানুষও সংখ্যায় অতি নগন্য। এই দুই শ্রেণীর মানুষের কাছেই অনেক কিছু শিক্ষণীয় আছে। বাবা হিমু মনে রাখিও অতি ভয়ঙ্কর যে গরল তাহাতেও অমৃত মিশ্রিত থাকে। অতি পবিত্র অমৃতে থাকে প্রাণসংহারক গরল। খাদ ছাড়া সোনা হয় না। গরল ছাড়া অমৃতও হয় না।"

হাজতের দরজা খুলেছে। দুবলা পুলিশ আমার দিকে তাকিয়ে ইশারা করল। কথা বলার পরিশ্রম করতেও সে মনে হয় রাজি না।

ওসি সাহেবের সামনে দাঁড়ালাম। তিনি পা থেকে মাথা পর্যন্ত আমাকে দেখলেন। চোখ মুখ কুঁচকালেন। একজন শিক্ষক যেমন যাকেই দেখেন তাকেই ছাত্র মনে করেন একজন পুলিশ অফিসারও যাকে দেখেন তাকে খারাপ ধরনের ক্রিমিন্যাল মনে করেন। আমি অতি বিনয়ী টাইপ হাসি দিয়ে বললাম, স্যারের শরীর এবং মন কি ভালো? কোনো ক্রিমিন্যাল শরীর স্বাস্থ্যের কথা জিজ্ঞেস করলে রাগে শরীর জ্বলে যাবার কথা। ওসি সাহেবের শরীর জ্বলল না। তিনি

চোখ মুখ কুঁচকেই রাখলেন তবে ভদ্র স্বরে বললেন, 'বসুন।'

আমি বসলাম। ওসি সাহেব চোখে চশমা পরতে পরতে বললেন— 'শুনলাম আপনি একজন কবি।'

আমি বিনয়ী ভঙ্গিতে বললাম, 'জি স্যার কবি। মনে একটা ক্ষোভ ছিল পুলিশ বিডিআর এবং আর্মিকে নিয়ে কেন কবিতা লেখা হয় না। এরাও তো জনগোষ্ঠির অংশ। রবীন্দ্রনাথ কত কিছু নিয়ে কত কবিতা লিখেছেন— অথচ পুলিশ নিয়ে কোনো কবিতা লিখেন নি ভাবলেই মনটা খারাপ হয়ে যায়। উনি লিখেছেন— "ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা।" তা না লিখে তিনি অনায়াসে লিখতে পারতেন— "ও আমার দেশের পুলিশ তোমার পায়ে ঠেকাই মাথা।" এতে পুলিশ ভাইদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হত।'

'ফাজলামি করবেন না।'

'জি আচ্ছা স্যার।'

'আবুল কালাম লোকটা কে?'

'গুরুত্বপূর্ণ কেউ না স্যার।'

'গুরুত্বপূর্ণ তো বটেই পুলিশের আইজি তার ব্যাপারে ইন্টারেস্টেড। সে সাধারণ লোক হবে কীভাবে?'

আমি গলা নামিয়ে বললাম, 'পুলিশের আইজি ইন্টারেস্টেড কারণ তাঁকে অনেক উপর থেকে চাপ দেওয়া হয়েছে।

'সেই অনেক উপরটা কী?'

'তা তো স্যার বলা যাবে না।'

'আচ্ছা ঠিক আছে আপনি আবুল কালামকে নিয়ে চলে যান।'

'ছেড়ে দিচ্ছেন?'

'জি ছেড়ে দিচ্ছি। চা খাবেন?'

'না চা খাব না। তবে ছোট্ট একটা কাজ করলে খুব উপকার হয়— মারের চোটে আবুল কালাম সাহেবের নাকের লোম বের হয়ে গেছে। উনি একজন অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। নাক দিয়ে লোম বের করা অবস্থায় তাঁকে নিয়ে যাওয়া ঠিক না। যদি তাঁর নাকের লোমগুলি একটু ছেঁটে দেবার ব্যবস্থা করেন। খুব উপকার হয়।'

ওসি সাহেব হতভম্ব গলায় বললেন, 'তার মানে?'

'আপনাদের ডিউটি অফিসারকে বললেই বুঝবেন। উনি কোনো কারণ ছাড়া আমাকে হাজতে ঢুকিয়েছেন। উনি যদি কষ্ট করে আবুল কালাম সাহেবের নাকের

লোম ছেটে দেন— তা হলে আমি কিছু মনে রাখব না। কবি বলেছেন— Forget and Forgive, ক্ষমাই মহত্ত্বের লক্ষণ। উনাকে দেখেই বুঝেছি উনি মহান। উনি মহান। উনি মহান একুশে।'

ওসি সাহেব আগুন চোখে তাকিয়ে আছেন। তিনি বেল টিপে ডিউটি অফিসারকে ডাকালেন।

আমি গলা নামিয়ে অতি বিনয়ের সঙ্গে বললাম, 'আরেকটা ফুলের মালা যদি আনিয়ে দেন। আবুল কালাম সাহেবের গলায় মালাটা পরাব। গলায় মালা পরে জেল থেকে অনেকে বের হয়েছেন। হাজত থেকে কেউ বের হন নি। একটা রেকর্ড হয়ে যাক।'

'আপনার নাম হিমু?'

'জি।'

'এই দিন দিন না আরো দিন আছে— এই গানটা শুনেছেন?'

'টিভিতে দেখেছি স্যার। কুদ্দুস বয়াতী একদল বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে গানটা করে।'

'গানের কথাগুলি মনে রাখবেন। ভবিষ্যতে আপনাকে যদি আমি ট্রিট করতে না পারি তা হলে আকিকা করে আমি আমার নাম আলম খান বদলায়ে রাখব— কুত্তা খান। আপনি আকিকার দাওয়াত পাবেন।'

রাগে ওসি সাহেবের শরীর কাঁপছে। তিনি রাগ সামলাতে পারছেন না। ডিউটি অফিসার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। ওসি সাহেব তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন— 'এই লোক কী বলছে শুনুন আর একটা ফুলের মালা আনিয়ে দিন।'

আবুল কালাম সাহেবের গলায় গাদা ফুলের মালা। তিনি এলোমেলো ভঙ্গিতে পা ফেলছেন। আমি বললাম, 'শরীরটা কি বেশি খারাপ লাগছে?'

'জি না।'

'মালা গলায় নিয়ে হাঁটতে যদি খারাপ লাগে মালাটা খুলে ফেলুন।'

'জি না।'

'রিকশা নেব?'

'না।'

'যাবেন কোথায় ঠিক করেছেন? মেসে ফিরে যাবেন?'

'না।'

'ঢাকায় আত্মীয়স্বজন কেউ আছে? ঠিকানা বলুন সেখানে নিয়ে যাই।'

'ঢাকায় তেমন পরিচিত কেউ নাই। দেশের বাড়ি চলে যাব চাঁদপুর। লঞ্চে করে যাব।'

'চা খাবেন? চলুন কোনো রেস্টুরেন্টে বসে চা খাই, তারপর ঠিক করি কী করা হবে। চাঁদপুরে চলে যেতে চাইলে চলে যাবেন।'

'পুলিশের কাছে হাজিরা দিতে হবে না?'

'না। আপনাকে পুলিশ আর ঘাঁটাবে বলে মনে হয় না। আইজি সাহেব আপনার প্রসঙ্গে যেভাবে বলেছেন তারপর আর কিছু বলার থাকে না।'

'উনি কি বলেছেন আমি সৎলোক।'

'বলেছেন।'

'কেন বলেছেন উনি তো আমাকে চিনে না।'

'আমি তাঁকে বলতে বলেছিলাম। উনি আপনাকে না চিনলেও আমি চিনি।'

'হিমু ভাই আপনার ধারণা আমি একজন সৎলোক?'

'অবশ্যই।'

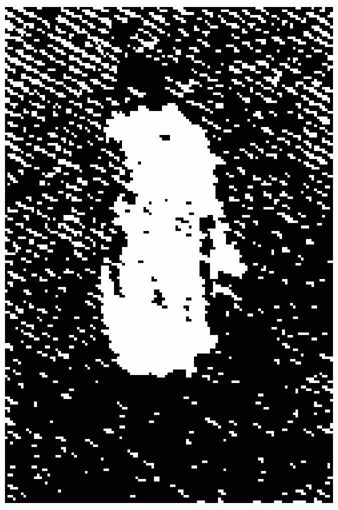
আবুল কালাম সাহেব বিড়বিড় করে বললেন, 'এই প্রথম একজন কেউ বলল, আমি সৎলোক। এর আগে কেউ কোনোদিন বলে নাই। স্কুলে পড়ার সময় আমি একবার একটা কলম চুরি করেছিলাম— তারপর আমার নাম হয়ে গেল— চোর কালাম। স্কুলে দুজন কালাম ছিল। তাকে ডাকত ভালো কালাম, আমাকে ডাকত চোর কালাম।

'কে কী ডাকত তাতে কিছু যায় আসে না। আপনি তো জানেন আপনি কী? আপনি নিজেকে জানেন না?'

'জানি। আমি হলাম চোর কালাম। দুই লাখ টাকা আমি সত্যিই চুরি করেছি। আপনি ফুলের মালা গলায় পরিয়ে একটা চোরকে বের করে নিয়ে এসেছেন। কাজটা ঠিক করেন নাই।'

কালাম সাহেব বড় বড় করে নিশ্বাস নিচ্ছেন। আমি তাকিয়ে আছি। কালাম সাহেব তাকালেন আমার দিকে। শান্ত গলায় বললেন, 'আমি এখন সদরঘাট টার্মিনেলে চলে যাব। সেখান থেকে যাব চাঁদপুর। ভাই সাহেব যাই?'

ফুলের মালা গলায় দিয়ে কালাম সাহেব হেঁটে হেঁটে যাচ্ছেন। আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে আছি। আরো অনেকেই তাঁকে দেখছে। গাদা ফুলের মালা গলায় দিয়ে ঢাকা শহরে কেউ হাঁটাহাটি করে না।



জয়নাল সাহেব অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। গায়ে জ্বর, বুকে সামান্য ব্যথা। বিছানায় শুয়ে থাকতে হয়— উঠে বসলেই বুক ধড়ফড় করে, নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। কিছু খেতেও পারছেন না। খাবার মুখে দিলেই বমি আসে। তাঁর চেহারা একদিনে নষ্ট হয়ে গেছে। চোখের নিচে কালি পড়েছে, গোলগাল মুখ লম্বাটে হয়ে গেছে। কথাও বলছেন হাসের মতো ফ্যাসফেসে গলায়।

অসুখটা হয়েছে আমার কারণে। আমি আবুল কালামকে দেখতে গিয়ে ফিরছি না দেখে তিনি টেনশনে অস্থির হয়ে আমার খোঁজ নিতে থানায় যান। সেখানে জানতে পারেন আমাকে হাজতে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। তখনি তাঁর বুকে ব্যথা শুরু হয়। থানার সামনের রাস্তার পাশের নর্দমায় দুবার বমি করেন। লোকজন তাঁর অবস্থা দেখে ফুটপাতেই শুইয়ে দেয়। আধঘন্টা ফুটপাতে বিশ্রাম করে মেসে ফিরে শয্যাশায়ী।

আমি বললাম, 'সামান্য কারণে বুকে ব্যথা বাধিয়েছেন? উঠে বসুন তো। আমি ঠিকঠাক মতো ফিরে এসেছি।

জয়নাল সাহেব ক্লান্ত গলায় বললেন, আপনাকে দেখে খুবই আনন্দ লাগছে ভাই সাহেব কিন্তু বুকের ব্যথাটা যাচ্ছে না। নিশ্বাস নিতে পারছি না।

সন্ধ্যাবেলা জয়নাল সাহেবের বুকে ব্যথা আরো বাড়ল। মেসের সামনে গ্রিন ফার্মেসির ডাক্তার সাহেবকে ডেকে নিয়ে এলাম। ডাক্তার বললেন, 'পেটে গ্যাস হলে বুকে ব্যথা হয়। মনে হচ্ছে পেটে গ্যাস হয়েছে। এন্টাসিড দিচ্ছি— এতেই কাজ হবে। ইসিজি করে দেখতে পারেন। হার্টের কোনো প্রবলেম থাকলে ধরা পড়বে। আমি অবিশ্যি তার কোনো দরকার দেখি না। তবু সেফ সাইডে থাকা। আমার পরিচিত একটা ক্লিনিক আছে। আমার নাম বলবেন টুয়েন্টি পারসেন্ট ডিসকাউন্ট দিয়ে দিবে।

রাত একটার দিকে জয়নাল সাহেবের অবস্থা খুব খারাপ করল। তাঁর প্রচণ্ড চোয়ালে ব্যথা শুরু হল। গা ঘামতে লাগল। তিনি বিড়বিড় করে বললেন, 'হিমু

ভাই, মনে হয় মারা যাচ্ছি। যদি অপরাধ কিছু করে থাকি ক্ষমা দিয়ে দেবেন।'

'আচ্ছা যান ক্ষমা দিলাম।'

'এইভাবে বললে হবে-না ভাই সাহেব। আল্লাহ পাককে বলতে হবে— খাস দিলে ক্ষমা করতে হবে।'

'আমি বললাম, ক্ষমার অংশটা আপাতত স্থগিত থাকুক। এই মুহূর্তে যা করতে হবে তা হল আপনাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। আমার ধারণা আপনার হার্ট এটাক হয়েছে। লক্ষণ তাই বলে।'

'এত রাতে এম্বুলেন্স পাবেন?'

'দেখি চেষ্টা করে। এম্বুলেন্স না পেলে গাড়ি। গাড়ি না পেলে রিকশা, একটা ব্যবস্থা হবেই। হাসপাতাল পর্যন্ত বেঁচে থাকার চেষ্টা চালিয়ে যান।'

প্রয়োজনে কিছুই পাওয়া যায় না এরকম কথা ভুল প্রমাণিত করে একটা এম্বুলেন্স অতি দ্রুত উপস্থিত হল। স্ট্রেচারে এম্বুলেন্সের লোকজন জয়নাল সাহেবকে নামিয়ে নিয়ে গেল। এম্বুলেন্সের পোঁ পোঁ শব্দ।

এত রাতেও লোক জমে গেল। জয়নাল সাহেব তাঁদেরকে দেখে লজ্জিত ভঙ্গিতে হাসতে লাগলেন। বিড়বিড় করে বলতে লাগলেন, 'কিছুই হয় নাই সামান্য বুকে ব্যথা।'

পত্রিকায় প্রায়ই ডাক্তারদের অবহেলার কারণে মৃত্যুর খবর পড়ি। সোহরাওয়ার্দি হাসপাতালে নিয়ে যাবার পর ডাক্তারদের ছোটাছুটি দেখে মনে হল পত্রিকার খবর সব সত্যি না।

একজন রোগী চেহারার মহিলা ডাক্তার আমাকে ডেকে নিয়ে বললেন, 'রোগীর অবস্থা খুবই খারাপ। ম্যাসিভ এটাক হয়েছে। দুদিন না কাটলে কিছুই বলা যাচ্ছে না।'

আমি বললাম, 'আমার কি কিছু করণীয় আছে?'

'আপনার কিছুই করণীয় নেই। অষুধপত্র কিনে দিতে হবে। সঙ্গে টাকা পয়সা আছে?'

'না। তবে যোগাড় করতে পারব।'

'যোগাড় করুন। আপাতত আমরা চালাচ্ছি।'

'রোগী কি বাঁচবে?'

মহিলা ডাক্তার কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'রোগী আপনার কী হয়?'

'কেউ হয় না। আমরা একই মেসে থাকি।'

'আপনি রোগীর আত্মীয়স্বজনকে খবর দিন। রোগীর বেঁচে থাকার সম্ভাবনা খুবই কম।'

'বলেন কী?'

'যান টাকা পয়সা ব্যবস্থা করুন। সকালের মধ্যে যোগাড় হলেও চলবে। আমরা চালিয়ে নেব।'

আমি ছোট্ট নিশ্বাস ফেলে বললাম, 'রোগীর দিকে একটু লক্ষ্য রাখবেন। এই বেচারা অতি সাধারণ একজন মানুষ কোনো মন্ত্রীর আত্মীয় না, কিছু না। তার সুপারিশ করার কেউ নেই।'

'আপনার নাম কী?'

'হিমু।'

'হিমু সাহেব শুনুন। আমরা সব সময় বলি— সব মানুষ সমান। একজনের সঙ্গে আরেকজনের কোনো প্রভেদ নেই। কার্যক্ষেত্রে কখনোই সেরকম দেখা যায় না। শুধু শেষ সময়ে, মৃত্যুর খুব কাছাকাছি এসে সব মানুষ এক হয়ে যায়। শুধু তখনই দেশের প্রধানমন্ত্রী এবং রাস্তায় ইট ভাঙে যে মেয়ে তার মধ্যে কোনো তফাৎ থাকে না। এই হাসপাতালের রোগীরা মৃত্যুর খুব কাছাকাছি থাকেন কাজেই তারা সব সমান। বাইরের মানুষরা বিশ্বাস করুক বা না করুক আমরা সবাইকে একইভাবে দেখি। দেখতে দেখতে আমাদের অভ্যাস হয়ে গেছে। আপনি কি আমার কথা বিশ্বাস করলেন?'

'জি বিশ্বাস করলাম। আমি টাকা নিয়ে আসছি। সকাল হবার আগেই চলে আসব।'

ফরিদা খালা অবাক হয়ে বললেন, 'তুই এত রাতে?'

আমি বললাম, 'কেমন আছ খালা?'

'রাত দুটার সময় 'কেমন আছ খালা?' এর মানে কী? তুই সবার সঙ্গে ফাজলামি করিস বলে আমার সঙ্গেও করবি? কলিংবেল শুনে আমার বুক ধ্বক করে উঠেছে— এখনো ধ্বক ধ্বকানি হচ্ছে। এত রাতে কেন এসেছিস? তোর মতলবটা কী?'

'বিল নিতে এসেছি খালা।'

'বিল মানে? কিসের বিল?'

'আশাকে নিয়ে দুদিন ঢাকা শহর দেখালাম। প্রতিদিন এক শ' ডলার করে দু শ' ডলার। পেমেন্টটা বাংলাদেশী কারেন্সিতে করলে ভালো হয়।'

'অনেক রসিকতা করেছিস। আর করতে হবে না। তুই এক্ষুনি বিদেয় হবি। এই মুহূর্তে। আমার সঙ্গে নাটক করবি না।'

'নাটক করছি না খালা। বিলটা আমার দরকার। তোমার কাছে যদি থাকে তুমি দিয়ে দাও। আর যদি না থাকে আশাকে ডেকে তোল।'

খালা কঠিন চোখে তাকিয়ে রইলেন। আমি বললাম, 'রাতে কিছু খাই নি। ভাত খাব। তরকারি না থাকলে একটা ডিম ভেজে দাও। তোমার ঘরে তো সব সময় টাঙ্গাইলের গাওয়া ঘি থাকে। গরম ভাতের উপর ওই ঘি তরকারির চামচে এক চামচ ঢেলে দেবে। ডিম ভাজবে। সেই সঙ্গে দুটা শুকনা মরিচ ভাজবে।'

'হিমু শোন, তুই খুবই মতলববাজ ছেলে। মতলব ছাড়া তুই কখনো কিছু করিস না। রাত দুটার সময় এসেছিস। মতলব নিয়েই এসেছিস। এবং আমি যে সেই মতলব একেবারেই টের পাচ্ছি না, তাও না। তোকে তো অনেক দিন ধরেই দেখছি— তোর নাড়ি নক্ষত্র আমি জানি।'

'জানলে বল দেখি আমার মতলব কী?'

'তোর মতলব হচ্ছে আশার সঙ্গে কিছুক্ষণ লটরপটর করা। তার মাথাটা আরো খারাপ করে দেওয়া। মেয়েটাকে হকচকিয়ে দিতে হবে। রাত দুটার সময় বিলের টাকা চাইলে সে হকচকিয়ে যাবে। ঠিক বলছি না?'

'হুঁ।'

'তুই চলিস পাতায় পাতায়— আমি চলি— শিরায় শিরায়। আমাকে হাইকোর্ট দেখাবি না। আমি বাস করি হাইকোর্টের ভিতরে।'

'গলা নামিয়ে কথা বল খালা— তুমি সবার ঘুম ভাঙাবে।'

'তুই বাসা থেকে বের হবি কি না সেটা বল।'

'ভাত খেয়ে যাই— ক্ষুধার্ত মানুষকে না খাইয়ে বিদেয় করলে— তুমিই পরে অনুশোচনায় দগ্ধ হবে। তোমার অনিদ্রা হবে। অনিদ্রা থেকে পেপটিক আলসার... সেখানে থেকে...'

'চুপ থাক। একটা কথাও না চুপ।'

আমি চুপ করলাম আর তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আশা দরজা ধরে দাঁড়াল। দেখে মনে হচ্ছে সে সেজেগুজে আছে। চুল আঁচড়ানো। গায়ে ইস্ত্রি করা শাড়ি। ইস্ত্রি করা শাড়ি পরে রাত দু'টার সময় কেউ বসে থাকে না। ঠোঁটে লিপস্টিকও

থাকার কথা না। আশার ঠোঁটে টকটকে লাল রঙের গাঢ় লিপস্টিক। আশা আমার দিকে তাকিয়ে শান্ত গলায় বলল— "আমার ঘরে আসুন।'

খালার দিকে তাকিয়ে আমি বললাম, 'খালা যাব?'

খালা জবাব দিলেন না। চোখ মুখ শক্ত করে তাকিয়ে রইলেন।

আশা বলল, 'দাঁড়িয়ে আছেন কেন আসুন।'

খালার মুখ রাগে থমথম করছে। এই রাগ সহজে যাবার না। আমি বললাম, 'খালা তুমি ভাত-ডিমভাজির ব্যবস্থা কর আমি এই ফাঁকে আশার সঙ্গে কথা বলে আসি। পেমেন্টটাও নিয়ে আসি।'

বিদেশিনী মেয়ের ঘর খুব গোছানো থাকবে, সুন্দর করে বিদেশী কায়দায় সাজানো থাকবে। ব্যাপার সেরকম না, আশার শোবার ঘরের খুবই এলোমেলো অবস্থা। খাটের বিছানায় রাজ্যের ম্যাগাজিন। মেঝেতেও বালিস চাদর পাতা। ঘরময় কাপড়চোপড় পড়ে আছে।

'আপনি যে আজ আসবেন আমি জানতাম।'

'তাই নাকি?'

'সন্ধ্যা সাতটার সময় হঠাৎ মনে হল আপনি আসবেন। আমি আপনার খালাকে বললাম— আজ হিমু সাহেব আসবেন, রাতে খাবেন। আপনি উনার ফেভারিট আইটেম রান্না করুন। আপনার খালা বললেন— ও আসবে তোমাকে কে বলল? আমি বললাম, কেউ বলে নি কিন্তু আমি জানি উনি আসবেন।'

'তোমার মাথা থেকে কি Fruit Flower দূর হয়েছে?'

'না হয় নি— যখন চুপ করে থাকি তখন হয়। যখন কথা বলি তখন থাকে না। এই যে কথা বলছি এখন নেই। কথা বন্ধ করে চুপ করে থাকলেই আবার চলে আসবে। এই জন্যে কথাও বেশি বলছি। আমার কথা শুনে আপনার হয়তো কান ঝালাপালা করছে। কিন্তু উপায় নেই। যখন বেলটা বাজল তখনই বুঝেছি আপনি এসেছেন। বের হতে দেরি করেছি কেন জানেন?'

'না জানি না।'

'আন্দাজ করুন।'

'আন্দাজও করতে পারছি না।'

'খুব গরম লাগছিল এইজন্যে পুরোপুরি নগ্ন হয়ে শুয়েছিলাম। আমার এই অভ্যাস আছে। ঘুমুতে যাবার সময় গায়ে কাপড় থাকলে দমবন্ধ লাগে। আমার কথা শুনে আপনি হয়তো আমাকে খুব খারাপ একটা মেয়ে ভাবছেন। ভাবলেও

কিছু করার নেই। আমি যা তাই। বেল শোনার পর কাপড় পরলাম, চুল আঁচড়ালাম। ঠোঁটে লিপস্টিক দিলাম। আপনার কি মনে হচ্ছে আমি খুব খারাপ টাইপ একটা মেয়ে।'

'না মনে হচ্ছে না।'

'যার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে সে আমার রাতে ঘুমুবার এই অভ্যাস জানলে আমাকে খুবই খারাপ চোখে দেখবে। এই জন্যে আমি কি ঠিক করেছি জানেন? আমি ঠিক করেছি যার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে তাকে আমি আমার এই অভ্যাসের কথা আগে ভাগেই বলে দেব।'

'এটা তো ভালো।'

'আমি কি কথা বেশি বলছি?'

'সামান্য বেশি বলছ। এটা খারাপ না। তোমার বয়েসী মেয়েরা বেশি কথা না বললে ভালো লাগে না। মনে হয় কোথাও কোনো গণ্ডগোল আছে।'

'আমি ঠিক করেছি খুব শিগগিরই বিয়ে করব। কেন বিয়ে করব জানেন? বিয়ে করলে যখন-তখন স্বামীর সঙ্গে বক বক করা যাবে। মাথার অসুখটা নিয়ে তখন আর বেশি ভাবতে হবে না। কী ধরনের স্বামী আমার পছন্দ বলি?'

'হ্যাঁ বল।'

'হাইট হবে পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চি। আপনার হাইট—কত?'

'জানি না তো— কখনো মাপি নি।'

'আপনার ধারণা আপনার হাইট পাঁচফুট সাত। আমার কাছে গজ ফিতা আছে। আমি এক্ষুনি মেপে আপনার হাইট বলে দিচ্ছি। আমার স্বামীর চোখ খুব সুন্দর হতে হবে। চোখে স্বপ্ন থাকতে হবে। মায়া থাকতে হবে। আচ্ছা হিমু সাহেব শুনুন— কেউ কি আপনাকে বলেছে আপনার চোখ খুব সুন্দর?'

'না বলে নি।'

'আমি বললাম। পুরুষ মানুষের এত সুন্দর চোখ এর আগে আমি দেখি নি। আমার কথা শুনে কি মনে হচ্ছে আমি আপনার প্রেমে পড়ে গেছি?'

'হুঁ মনে হচ্ছে।'

'আমার অনেক দিন থেকেই ক্ষীণ সন্দেহ হচ্ছিল— আজ আমিও নিশ্চিত হয়েছি যে আমি পাগলের মতো আপনার প্রেমে পড়ে গেছি—। কীভাবে নিশ্চিত হলাম জানেন? আপনাকে দেখার পর থেকে আমার কান্না পাচ্ছে। Strange type কান্না। মনে হচ্ছে সারা শরীরে কান্নাটা ছড়িয়ে আছে। ব্যথার মতো অনুভূতি।

ব্যথাটা দলা পাকিয়ে ঢেউ এর মতো গলা পর্যন্ত ওঠে আসছে। সরি অনুভূতিটা আপনাকে বুঝাতে পারছি না।

'আমি বুঝতে পারছি।'

'কী বুঝতে পারছেন?'

'বুঝতে পারছি যে তোমার শরীরটা খুব খারাপ। মাথার ভেতর ফুল-ফল ঘুরছে, কড়া ঘুমের অষুধ খাচ্ছ— সব মিলিয়ে অবস্থাটা ভালো না। যুক্তি দিয়ে চিন্তা করার ক্ষমতা তোমার নষ্ট হয়ে গেছে। মাথায় মধ্যে এলোমেলো ব্যাপার চলে এসেছে। এলোমেলো ভাবটা চলে গেলেই তুমি স্বাভাবিক হয়ে যাবে। আমাকে দেখে তখন আর কোন ব্যথা দলা পাকিয়ে উপরের দিকে উঠবে না। গজ ফিতা দিয়ে আমার হাইট মাপার ইচ্ছাও করবে না।'

'আপনি মনে হচ্ছে বিরাট জ্ঞানী। জগতের সব জ্ঞান নিয়ে নিয়েছেন। আপনার জ্ঞানের ভাণ্ডার আমাকে দেখানোর দরকার নেই।'

'রাগ করছ কেন?'

'রাগ করছি না। আপনি আপনার পেমেন্ট নিতে এসেছেন নিয়ে চলে যান। আপনার পাওনা কত?'

'দু শ' ডলার। বাংলাদেশী টাকায় দশ হাজার টাকা। পেমেন্টটা বাংলাদেশী কারেন্সিতে করলে ভালো হয়।'

'আপনি আপনার খালার কাছে গিয়ে বসুন। আমি টাকা নিয়ে আসছি।'

'থ্যাংক য়্যু।'

'আমার ধারণা এত টাকা ঘরে নেই। ব্যাংক না খুললে দিতে পারব না। আপনি কি আগামীকাল ব্যাংক আউয়ারের পরে এসে টাকাটা নিতে পারেন?'

'আমার টাকাটা এখনি দরকার।'

'আপনি ড্রয়িং রুমে বসুন। দেখি কী করা যায়।'

হাসপাতালে ফিরতে ফিরতে রাত তিনটা বেজে গেল। জয়নাল সাহেবকে রাখা হয়েছে ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে। দর্শনার্থীদের সেই ঘরে প্রবেশ নিষেধ। মহিলা ডাক্তারের দয়ায় সেখানে ঢোকার অনুমতি পাওয়া গেল। জয়নাল সাহেব চোখ বন্ধ করে পড়ে আছেন। তাঁর শরীরে নানা রকম তার লাগানো। মনিটারে কী সব দেখা যাচ্ছে। পিপ পিপ শব্দ হচ্ছে। আমি জয়নাল সাহেবের কপালে হাত রাখতেই তিনি জেগে উঠলেন। চোখ মেলে ক্লান্ত গলায় বললেন, 'হিমু ভাই আপনাকে বিরাট

তকলিফ দিলাম। আপনার কাছে আমি ক্ষমা প্রার্থী। দয়া করে ক্ষমা করুন।'

'ক্ষমা করলাম। আপনার মনে হয় কথা বলা নিষেধ। কথা না বলে চুপচাপ শুয়ে থাকুন। আমি বরং কিছুক্ষণ আপনার মাথায় হাত বুলিয়ে দেই। আপনার কাছে শেখা বিদ্যা কাজে লাগাই।'

জয়নাল সাহেব আমার হাত ধরে ফেললেন। ফিসফিস করে বললেন, আমার কথা বলা নিষেধ আমি জানি। কিন্তু আমার সময় শেষ হয়ে গেছে। কথা বলার সুযোগ আর পাব না।'

'সময় শেষ কে বলল?'

'কেউ বলে নাই। এইসব জিনিস বোঝা যায়। যতবার চোখ বন্ধ হয়ে আসে আমি আমার মৃত আত্মীয়স্বজনদের দেখি। এরা বিছানার চারপাশে গোল হয়ে বসে আছে। এরা আমাকে নিতে এসেছে। এখনো বসে আছে— আপনি দেখতে পাচ্ছেন না। আমি আবছা আবছা দেখছি।'

'ও'

'আমার বাবার পাশে আমার বড় মা বসে আছেন। আপনাকে বলতে ভুলে গেছি। আমার বাবা দুই বিয়ে করেছিলেন। বিয়ের দুই মাসের মাথায় তাঁর প্রথম স্ত্রী মারা যায়। উনাকে আমি কখনো দেখি নি। কিন্তু আজ বাবার পাশে দেখেই চিনেছি। আমার নিজের মা বসে আছেন উলটো দিকে।'

'আপনি কি দয়া করে কথা বলা বন্ধ করবেন?'

'হিমু ভাই কয়েকটা জরুরি কথা আপনাকে বলব। না বললে আর বলা হবে না যদি ইজাজত দেন।'

'বলুন।'

'আমার মেয়েটার সঙ্গে একবার দেখা হওয়া খুব প্রয়োজন ছিল। তাকে একটা কথা বললে মনটা শান্ত হত।'

'কী কথা?'

'বেচারী নিশ্চয়ই ধারণা করে আছে তার বাবা ভয়ঙ্কর একটা মানুষ। তার মা'র মুখে এসিড মারার জন্যে এসিড কিনে লুকিয়ে রেখেছিল। আমার সম্পর্কে এত বড় একটা খারাপ ধারণা তার থাকবে ভাবলেই অস্থির লাগে। মেয়েটাকে যদি বলতে পারতাম— সমস্ত ঘটনাটা সাজানো। মন শান্ত হত।'

'মেয়েটাকে পুরো ব্যাপারটা খুলে বললে অন্য একটা সমস্যা হবে। মেয়েটা সারাজীবন তার মা'র সম্পর্কে ভয়ঙ্কর খারাপ ধারণা নিয়ে থাকবে। এটা কি

ঠিক হবে?'

জয়নাল সাহেব অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে শান্ত গলায় বললেন, না ভাই সাহেব এটাও ঠিক হবে না। বাবার সম্পর্কে খারাপ ধারণা থাকলে তেমন কিছু যায় আসে না, কিন্তু মা'র সম্পর্কে খারাপ ধারণা থাকলে কোনো ছেলে মেয়ে বড় হতে পারে না। আপনি একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস ধরে দিয়েছেন। এই জন্যেই আপনাকে এত পছন্দ করি। লোকে যে বলে— আপনার পাওয়ার আছে। এটা ঠিক। আসলেই আপনার পাওয়ার আছে।'

'আপনি ঘুমান আমি চলে যাই। আমি থাকলে আপনি ঘুমুতে পারবেন না।'

'ভাই সাহেব।'

'জি।'

'একটা শেষ কথা বলি মনে কিছু নিবেন না।'

'বলুন।'

'আপনার পাওয়ার আছে। আধ্যাত্মিক ক্ষমতা আছে। এই ক্ষমতা দিয়ে আপনি মেয়েটার সঙ্গে আমার শেষ দেখা করিয়ে দিন। বয়সে আমি আপনার অনেক বড় তবুও করজোড়ে ভিক্ষা চাচ্ছি।'

'ভাই আমার কোনো ক্ষমতা নেই। আমার একমাত্র ক্ষমতা হল খালি পায়ে রাস্তায় হাঁটা। বিভ্রান্তিকর কথাবার্তা বলে মানুষকে বিভ্রান্ত করে দেওয়া।'

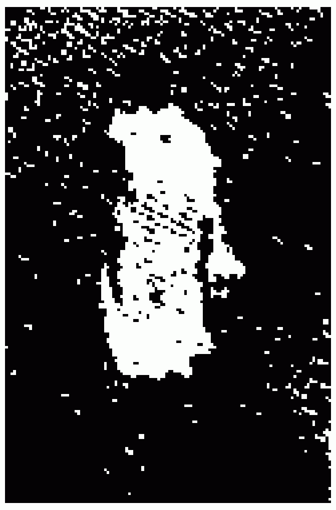
'হিমু ভাই আমি জানি আপনি ইচ্ছা করলেই পারবেন। হাত জোড় করছি ভাই সাহেব। মৃত্যুপথ যাত্রীর শেষ অনুরোধ।'

জয়নাল সাহেবের চোখ দিয়ে টপ টপ করে পানি পড়ছে। তিনি হাত জোড় করে আছেন।

একটা মিথ্যা আশ্বাস কি জয়নাল সাহেবকে দেব? সেটা কি ঠিক হবে? আমার বাবা তার পুত্রের জন্যে কিছু কঠিন উপদেশ লিখিতভাবে দিয়ে গিয়েছিলেন।

মিথ্যা সম্পর্কে তিনি বলেছেন—

> *'হে আমার প্রিয় পুত্র, মিথ্যার কিছু কিছু উপকার আছে। কিছু মিথ্যা সমাজের এবং ব্যক্তি জীবনের ক্ষেত্রে কল্যাণকর ভূমিকা নেয়। কিন্তু মিথ্যা মিথ্যাই। সত্য আলো, মিথ্যা অন্ধকার। তোমার যাত্রা আলোর দিকে। মিথ্যা ছলনাময়ী নানান ছলনায় তোমাকে ভুলাইবে। তুমি ভুলিও না। কখনো না, কোন অবস্থাতেই না। ইহা আমার আদেশ।'*



ভোর চারটার মেসে ফিরে দেখি— আবুল কালাম সাহেব আমার ঘরে বসা। চেয়ারে পা তুলে বসেছেন। মনে হচ্ছে মানুষ না কাপড়ের পুঁটলি। কতক্ষণ ধরে বসে আছেন কে জানে। মানুষটা ক্লান্ত এবং ক্ষুধার্ত লাগছে। গলায় ফুলের মালা নেই। ফুলের মালা পাঞ্জাবির পকেটে রাখা হয়েছে। মালার একটা অংশ পকেটের বাইরে। গাদা ফুলের জীবনী শক্তি ভালো। এতক্ষণেও ফুল চুপসে যায় নি। আমি হালকা গলায় বললাম, কালাম সাহেবের খবর কী?

কালাম সাহেব ফিসফিস করে বললেন, খবর ভালো না। খবর অত্যধিক খারাপ।

'শরীর খারাপ?'

'জি শরীর খারাপ, মন খারাপ, ভাগ্য খারাপ। আমার সবই খারাপ।'

'আপনি চাঁদপুরে যান নি?'

'না।'

'যান নি কেন?'

'জানি না কেন যাই নি। লঞ্চ টার্মিনেল পর্যন্ত গিয়ে ফেরত এসেছি। ঘণ্টা খানিক শহরে খামাখা ঘুরেছি। তারপর আপনার ঘরে এসে বসে আছি। সারারাত আপনি কোথায় ছিলেন?'

'এক রোগী নিয়ে ছোটাছুটি করেছি।'

'আমি যে আপনার এই চেয়ারটায় বসে আছি, বসেই আছি। চেয়ারে বসেই ঘুমায়েছি। ভাগ্য ভালো আপনার ঘর সব সময় খোলা থাকে। দরজা বন্ধ থাকলে ঘরে ঢুকতে পারতাম না।'

'খাওয়াদাওয়া করেছেন?'

'না। কেউ দেখে ফেললে সমস্যা হতে পারে— এই জন্যে ঘর থেকে বের হই নি। মারাত্মক পিসাব ধরেছে। পিসাব করতেও যাই নি।'

'এখন যেতে পারেন। কেউ দেখবে না। ভোর চারটায় চোর পর্যন্ত ঘুমায়। তোয়ালে দিয়ে মাথা ঢেকে চলে যান।'

কালাম সাহেব নড়লেন না। যেখানে বসেছিলেন সেখানেই বসে রইলেন। বরং আরো গুটিসুটি মেরে গেলেন। আমি বললাম, 'বাথরুম সেরে আসুন, কোন একটা চায়ের দোকানে বসে গরম পরোটা চায়ে চুবিয়ে খাই। আমারো ক্ষিধে লেগেছে।'

'এত ভোরে চায়ের দোকান খুলবে?'

'গনি মিয়ার চায়ের দোকান আছে সারারাতই খোলা থাকে।'

'চলুন যাই।'

চলুন যাই বলেও কালাম সাহেব বসে রইলেন। আমি বললাম, 'আপনার সমস্যাটা কি বলুন তো?'

'কোন সমস্যা নাই।'

'আমার ধারণা আপনি দুই লাখ টাকাটা ফিরত দিতে চান। এবং আপনি টাকা সঙ্গে নিয়ে এসেছেন। ধারণাটা কি ঠিক?'

'জি ধারণা ঠিক।'

'টাকা সঙ্গে আছে?'

'আছে। তিন শ' টাকা শুধু খরচ করেছি।'

আমি হাই তুলতে তুলতে বললাম, 'চলুন চা খাবার পর আপনাকে থানায় দিয়ে আসি। টাকাটাও ওসি সাহেবের কাছে জমা রাখি।'

'আপনি যা ভালো মনে করেন। টাকাটা আমি কেন ফেরত দিচ্ছি জানতে চান হিমু ভাই?'

'না।'

'জানতে চাইলেও বলতে পারতাম না। আমি নিজেও জানি না এই কাজটা কেন করলাম। ওসি সাহেব আবার মারধোর করেন কিনা কে জানে। মনে হয় করবে না। টাকা পেয়ে গেছে এখন আর মেরে কি হবে?'

'তিন শ' টাকা কম আছে এই জন্যে মারতে পারে। মারতে চাইলে অজুহাত তৈরি করতে কতক্ষণ। ঈশপের ওই গল্পটা জানেন না— এক ছাগলের বাচ্চা পানি খাচ্ছিল। সিংহ এসে বলল, কিরে চেংড়া হারামজাদা। তুই পানি নোংরা করছিস কোন সাহসে। আবার দাড়িও নাড়ছিস। তোর সাহস তো কম না।

'গল্পটা জানি না।'

'না জানলেও ক্ষতি নেই। এই যুগে ঈশপের গল্প অচল। উঠুন তো— চেয়ারে যেভাবে বসে আছেন মনে হচ্ছে শিকড় গজিয়ে গিয়েছে।'

কালাম সাহেব উঠে দাঁড়ালেন। আমি বললাম, 'ফুলের মালাটা গলায় পরে নিন। মালা পরিয়ে হাজত থেকে বের করেছি— আবার মালা পরিয়েই হাজতে ঢুকিয়ে দেব। গুনগুন করে গানও গাইতে পারেন— মালা পরা ছল মোদের এই মালা পরা ছল। মালা পরেই মালা মোরা করবে যে বিকল। গানটা জানেন?'

'জি না।'

ওসি সাহেব তাকিয়ে আছেন কিছু বলছেন না। তিনি যে বিস্মিত হয়েছেন সে রকমও মনে হচ্ছে না। ভাবলেশ হীন দৃষ্টি। এমনভাবে বসে আছেন যেন তিনি জানেন আমি কামাল সাহেবকে নিয়ে উপস্থিত হব। আমি বললাম, "স্যার টাকাটা গুনে নিন। দুই লাখের চেয়ে তিন শ' কম আছে। তিন শ' টাকা আপনার আসামি খরচ করে ফেলেছেন। কোন কোন খাতে খরচ করেছেন সেটাও লেখা আছে। এই যে স্যার খরচের ভাউচার।"

পেন্সিলে লেখা ভাউচারটায় ওসি সাহেব চোখ বুলালেন। কালাম সাহেব সব বেশ গুছিয়েই লিখেছেন।

জমা দুই লক্ষ টাকা মাত্র।

খরচ

বিরিয়ানি ফুল প্লেট	৪০ টাকা
হাফ খাসির রেজালা	২০ টাকা
দুই প্যাকেট সিগারেট	১০০ টাকা
দই-মিষ্টি	৩০ টাকা
বেবি টেক্সি ভাড়া	৫০ টাকা।
রিকশা ভাড়া	৬০ টাকা।
মোট খরচ	**৩০০ টাকা।**

ব্যালেন্স এক লক্ষ নিরানব্বুই হাজার সাতশত টাকা মাত্র।

পুলিশের লোক চোখের ইশারায় খুব ভালো কথা বলতে পারে। ওসি সাহেব মুখে কিছু বললেন না, চোখে ইশারা করলেন এতেই কাজ হল। একজন এসে টাকা গুনতে শুরু করল। অন্য আরেকজন কালাম সাহেবকে নিয়ে হাজতে ঢুকিয়ে দিল।

আমি বিনীত ভঙ্গিতে বললাম, স্যার আমি যাই।

ওসি সাহেব বললেন, যাবেন কোথায় বসুন। টাকা জমা দিয়েছেন। রশিদ নিয়ে যান। চা খাবেন?

'জি না।'

'সিগারেট?'

'জি না।'

ওসি সাহেব সিগারেট ধরিয়ে লম্বা টান দিতে দিতে বললেন, 'আপনি কি মিথ্যা কথা বলেন?'

আমি বললাম, 'বলি।'

ওসি সাহেব স্বস্থির নিশ্বাস ফেলে বললেন, যাক বাঁচা গেল। যারা সব সময় সত্যি কথা বলে— আমরা পুলিশরা তাদের ব্যাপারে শঙ্কিত থাকি। দু' ধরনের মানুষ সব সময় সত্যি কথা বলে— সাধু সন্ত মানুষ। আর ভয়ঙ্কর যারা ক্রিমিন্যাল। মাঝখানের মানুষরা সত্যমিথ্যা মিশিয়ে বলে। এদেরকে নিয়ে পুলিশ দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত না।

টাকা গুনা শেষ হয়েছে। ওসি সাহেব আমাকে রশিদ দিলেন। আমি বললাম, 'স্যার যাই।'

ওসি সাহেব বললেন, 'না। আপনার সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করি। অসুবিধা আছে?'

'জি না।'

ওসি সাহেব আমার দিকে ঝুঁকে এসে বললেন— 'আবুল কামালের গলায় ফুলের মালা দিয়ে তাকে বের করে আপনি নিয়ে গেলেন— সেই দৃশ্য কি মনে আছে?'

'জি স্যার আছে।'

'সেদিন সঙ্গত কারণেই আপনাকে অত্যন্ত সন্দেহজনক মানুষ বলে আমার মনে হয়েছিল।'

'মনে হওয়া স্বাভাবিক। আমি সন্দেহজনক মানুষ তো বটেই।'

'আমি তৎক্ষণাৎ আপনার পেছনে প্লেইন ক্লথ পুলিশ লাগিয়ে দিলাম। যাতে সে আপনার পেছনে আঠার মতো লেগে থাকতে পারে। তার দায়িত্ব ছিল আপনার প্রতিটি মুভমেন্ট ফলো করা।'

'আপনার কথা শুনে নিজেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে হচ্ছে স্যার।'

'আমরা জানি আপনি কি কি করেছেন। এম্বুলেন্স ডেকেছেন। রোগী নিয়ে হাসপাতালে গেছেন। রাত দুটায় ধানমন্ডির এক বাসায় গেছেন। আবার হাসপাতালে গেছেন। ভোর সাতটায় গনিমিয়া টি স্টলে নাশতা খেয়েছেন। আমি সবই জানি।'

'আপনি তো স্যার মোটামুটি ইশ্বরের কাছাকাছি চলে গেছেন। ইশ্বর যেমন সব জানেন, আপনিও সব জানেন।'

'আমি বাইরের কর্মকাণ্ড জানি। আপনার মনের ভেতর কি কাণ্ডকারখানা হচ্ছে সেটা জানি না।'

'সেটা স্যার আমিও জানি না।'

'আপনার রোগীর কি অবস্থা সেটা জানেন?'

'জি না।'

'রোগীর অবস্থা খুবই খারাপ। আমি ভোরবেলা খবর নিয়েছি। রাত সাড়ে তিনটার সময় হার্ট থেমে গিয়েছিল। ডাক্তাররা ইলেকট্রিক শক দিয়ে চালু করেছেন।'

'ও'

'রোগী আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন। আপনি নাকি তাকে কথা দিয়েছেন তাঁর মেয়েকে এনে দেবেন। তিনি মেয়েকে দেখতে চান। মেয়েটা কোথায় থাকে বলুন— আমি আনিয়ে দিচ্ছি। পুলিশ ফোর্স চলে যাবে। প্রয়োজনে অ্যারেস্ট করে নিয়ে আসবে।'

'মেয়েটা থাকে অস্ট্রেলিয়ায়।'

'বলেন কী। এই মেয়েকে আপনি আনাবেন কীভাবে?'

আমি ছোট্ট নিশ্বাস ফেলে বললাম, 'দেখি চেষ্টা করে। স্যার আপনার টেলিফোনটা একটু ব্যবহার করি?'

ওসি সাহেব টেলিফোন এগিয়ে দিলেন। আমি আশাকে টেলিফোন ধরলাম।

'আশা তুমি কি আমার জন্যে ছোট্ট একটা কাজ করবে? তোমার মাথায় ফুল-ফল ঘুরছে। তুমি খুব কষ্ট পাচ্ছ। এই কাজটা করলে তোমার মাথা থেকে ফুল ফল দূর হয়ে যাবে।'

'আপনিতো শুধু জ্ঞানী না। আপনি একজন ডাক্তারও? হাউ ফানি।'

'কারো যখন খুব ঘনঘন হেঁচকি উঠতে থাকে তখন ভয়ঙ্কর কিছু করলে হেঁচকি থেমে যায়। তুমি যদি ভয়ঙ্কর কোনো ঘটনার সামনে দাঁড়াও তোমার হেঁচকি থেমে যাবে।'

'কী করতে হবে আমাকে?'

'অভিনয় করতে হবে। মৃত্যুপথ যাত্রী এক বৃদ্ধের মেয়ের ভূমিকায় অভিনয় করতে হবে।'

'আমার সঙ্গে খেলা করবেন না। প্লিজ ডোন্ট প্লে গেমস উইথ মি।'

'আমি খেলা খেলছি না। অভিনয় অংশে তোমার নাম অহনা।'

'প্লিজ স্টপ ইট।'

'নাটকে তোমার বাবার নাম জয়নাল। এই জয়নাল তার মেয়েকে দুবছর বয়সে শেষ দেখা দেখেছে। এখন মেয়ের বয়স আঠারো। মেয়ের বাবা মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করছেন। মৃত্যুর সময় মেয়ের স্নেহময় মুখ দেখার জন্যে ব্যাকুল হয়ে আছেন।'

'এই মিথ্যার মানে কী?'

'কোনো মানে নেই। আবার হয়তো মানে আছে। আশা তুমি চলে এসো। সোহরাওয়ার্দি হৃদরোগ হাসপাতাল। ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট। যার নাম আশা সে যদি আশাহীন মানুষের মনে আশা না জাগায় কে জাগাবে? তুমি কি আসবে?'

ওসি সাহেব অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে বললেন, 'মেয়েটা কী বলল? আসবে?'

আমি বললাম, 'বলেছে আসবে না। তবে কেন জানি মনে হচ্ছে আসবে।'

'আপনি কি এখন হাসপাতালে যাচ্ছেন?'

'জি।'

'আমি কি আপনার সঙ্গে হাসপাতালে যেতে পারি?'

'অবশ্যই পারেন।'



নকল দৃশ্য। বানানো, মিথ্যা। কিন্তু দেখে সেরকম মনে হচ্ছে না। আশা গভীর মমতায় জয়নাল সাহেবের বুকে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে। তার চোখ ছলছল করছে। যে কোনো মুহূর্তে চোখ থেকে টপটপ করে পানি পড়বে। মন বড় টলমল করছে।

জয়নাল সাহেব বিড়বিড় কথা বলছেন। যে গাঢ় মমতা নিয়ে তিনি কথা বলছেন— এত মমতায় এর আগে কি কোনো পিতা তাঁর কন্যার সঙ্গে কথা বলেছে?

মাগো তুমি যে আসবা আমি জানতাম। হিমু ভাইকে যখন হাতজোড় করে বললাম আমার মেয়েটাকে এনে দেন। হিমু ভাই হ্যাঁ-না কিছুই বলল না। কিন্তু আমি বুঝেছি— কাজ হয়েছে। হিমু ভাই আমার মেয়েকে এনে উপস্থিত করবে।

আশা ফিসফিস করে বলল, আপনার খুব কষ্ট হচ্ছে, প্লিজ কথা বলবেন না।

জয়নাল সাহেব শান্ত গলায় বললেন, মাগো আমার কষ্ট হচ্ছে ঠিকই, শরীর জ্বলে যাচ্ছে। কিন্তু কী শান্তি যে পাইতেছি এটা একমাত্র আমি জানি আর আল্লাহ পাক জানেন। মা শোন আমার সময় হয়ে এসেছে। আমি চলে যাব। যাবার আগে তোমার জন্যে দোয়া করে গেলাম— খাস দিলে দোয়া করলাম।'

'ধন্যবাদ।'

'মাগো শোন, মানুষ তো ফেরেশতা না। মানুষ ভুল করে। আমি ভুল করতে পারি আবার তোমার মা-ও ভুল করতে পারে। ভুলগুলো মনে রাখবা না।'

'জি আচ্ছা।'

'তোমার চেহারাও তোমার মা'র মতো। সেই নাক সেই চোখ। চুল কটা। তোমার মা'র চুলও ছিল কটা। বড় সুন্দর মা। মাগো তুমি নানান দেশ বিদেশ ঘুরবে—

'উঁচু কপালী চিড়ল দাঁতি
পিঙ্গল কেশ
ঘুরবে কন্যা নানান দেশ'

কোনো একটা সমস্যা মনে হয় হয়েছে। ডাক্তার নার্সরা ছোটাছুটি শুরু করেছেন। ব্যাকুল হয়ে কাঁদছে আশা।

আমি ওসি সাহেবকে নিয়ে বাইরে চলে এলাম। ওসি সাহেবের চোখ ভর্তি পানি। তিনি চাপা গলায় বললেন— 'খুবই কষ্ট পেলাম। খাকি পোশাক পরে চোখের পানি ফেলা যায় না। খাকি পোশাকের এতে অপমান হয়। কিন্তু চোখের পানি আটকাতে পারলাম না। সরি।'

অনেকদিন পর আজ আবার বৃষ্টি নেমেছে। আকাশ ভরতি হয়ে যাচ্ছে ঘন কালো মেঘে। আমি ওসি সাহেবের দিকে তাকিয়ে বললাম— 'ওসি সাহেব বৃষ্টিতে কবে শেষবার ভিজেছেন বলুন তো?'

ওসি সাহেব রুমালে চোখ মুছতে মুছতে বললেন— 'খুব ছোটবেলায় ভিজেছি।'

'আজ চলুন তো আমার সঙ্গে বৃষ্টিতে ভিজবেন। নাকি খাকি পোশাক পরে বৃষ্টিতে ভিজলে পোশাকের অপমান হবে?'

'না অপমান হবে না।'

আমরা দুজন বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে এগোচ্ছি। ঝুম বৃষ্টি নেমেছে। লোকজন অবাক হয়ে দেখছে। কোমরে পিস্তল ঝুলিয়ে খাকি পোশাক পরা কেউ এভাবে বৃষ্টিতে ভেজে না।

'ওসি সাহেব!'

'জি।'

'বর্ষার কোনো গান কী আপনার জানা আছে।'

আমি গান জানি না ভাই। আমার স্ত্রী জানে। ওর গলা খুবই সুন্দর। একদিন যদি আসেন ওর গান শুনিয়ে দেব।'

'আপনার স্ত্রী বর্ষার কোনো গান করেন না? উনার কাছে শুনেছেন এমন একটা গান গুনগুন করে ধরুন।'

ওসি সাহেব গান ধরলেন—

এসো নীপবনে ছায়াবীথি তলে,
এসো করো স্নান নবধারা জলে ॥

Tomader Ei Nogore by Humayun Ahmed